~*TIN GOENDA SERIES*~

Dokhin Jatra By Rokib Hasan

For more free Books,Songs,Software,
PC games,Movies,Natok,
Mobile ringtones,games and themes etc.
please visit
www.murchona.com/forum

Scanned By:

Abu Naser Mohammad Hossain (Sumon)

Email:

anmsumon@yahoo.com,anmsumon@gmail.com

তিন গোয়েন্দা

দক্ষিণ যাত্রা

রকিব হাসান

দক্ষিণ মেরু।
সবাই জানে, বরফে ঢাকা ভয়ঙ্কর জায়গা।
আর্দ্রতা নেই বাতাসে।
শূন্যের নিচে তাপমাত্রা।
গায়ে রোদ লাগলে চামড়া পুড়ে যায়।
পৃথিবীর অন্যখানে অমাবস্যার রাতে
যেমন কালোর জন্যে কিছু দেখা যায় না,
এখানে দেখা যায় না সাদার জন্যে।
প্লেন নামাতে যাওয়া আত্মহত্যার সামিল।
কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় সেই কাজটাই
করতে চলল তিন গোয়েন্দা আর
দুর্ধর্ষ বেদুইন বৈমানিক ওমর শরীফ।
কোনভাবে মেরুর প্রতিকূলতা থেকে যদি বেঁচেও যায় ওরা,
খুন করতে আসবে গলাকাটা গুপ্তধন শিকারীর দল...

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: [illegible] বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

কিশোর থ্রিলার

তিন গোয়েন্দা

দক্ষিণ যাত্রা

রকিব হাসান

aimsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

সেবাপ্রকাশনীর
আরও ক'টি কিশোর-কাহিনী

তিন গোয়েন্দা সিরিজ:
তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা, ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো, প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগরসৈকত, জলদস্যুর দ্বীপ ১, ২, সবুজ ভূত, হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি, কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি, ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২, ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব, ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল, মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর, পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ, আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ, পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল, বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১, ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো, প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া, ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু, পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন, পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর, প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ, ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ, খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড, বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্থানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া, খুন!, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ, ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার, চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত, জিনার সেই দ্বীপ, ঐতিহাসিক দুর্গ, [illegible], কুকুরখেকো ডাইনী, নকল হাকিম, বিড়াল উধাও, ঠগবাজি, যুদ্ধ ঘোষণা, মারাত্মক ভুল, মরুভীতি, খেলার নেশা, [illegible] ভয়, দীঘির দানো, উল্কি রহস্য, নকশা, ডাকাতের পিছে, মৃত্যুঘড়ি, জলদস্যুর মোহর, শয়তানের থাবা, গুপ্তচর শিকারী, পতঙ্গ ব্যবসা, পুরানো কামান, টাকার খেলা, জাল নোট, মাকড়সা মানব, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন, বিষাক্ত অর্কিড, অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ, ভয়ঙ্কর অসহায়, সোনার খোঁজে, তুষার বন্দি, বিপজ্জনক খেলা, রাতের আঁধারে, প্রেতের ছায়া, আরেক ফ্রাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, রাত্রি ভয়ঙ্কর, গোপন ফর্মুলা, সৈকতে সাবধান, খেপা কিশোর, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর, তিন বিঘা।

অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ:
ষড়যন্ত্র ১,২, অনুসন্ধান, কালকূট, আমি টাইগার বলছি, মাকড়সার জাল।

রোমহর্ষক সিরিজ:
যাও এখান থেকে, বিষধর, নরবলি, পাগলাঘন্টি, চরমপত্র, অপারেশন বারমুডা ট্রায়াঙ্গল, পলাতক, নিরুদ্দেশ, অভিশপ্ত ছুরি, নরখাদকের দেশে, শ্বেতাঙ্গী।

গোয়েন্দা রাজু সিরিজ:
মামার মন খারাপ, সাবাস!, বিরোধী দল, নামী কুকুর, হিপ হিপ হুররে, চকোলেট কোম্পানী, নতুন হেডকোয়ার্টার, সার্কাস, খেলনা বিমান ও সোনার মেডেল, সূত্রের খেলা ও আবার ভূত, আজব বন্দি, জাহাজ চুরি, নকল পাথর, টাকের ওষুধ।

কিশোর হরর সিরিজ:
অদ্ভুত প্রেতাত্মা, কৃষ্ণমানব, অভিশপ্ত ক্যামেরা, জীবন্ত মমি, জাদুকরের কবলে, পাশের বাড়ির ভূত, অশুভ বস্তু, জাদুর ঘড়ি, অলৌকিক শক্তি, নেকড়েমানব, পিরামিডের আতঙ্ক, আয়নার ওপাশে, জন্তুদের ঘাঁটি, সাগর বিভীষিকা, সেই অভিশপ্ত ক্যামেরা, ভুতুড়ে সৈকত, ভয়ানক দুঃস্বপ্ন, রাত্রি যখন গভীর, অগ্নিপরীক্ষা, বিপদের মুখোমুখি, আতঙ্কের রাত, ঘুমালে বিপদ।

aminsumon@yahoo.com©
www.murchona.com©

এক

'দূর, ওকিমুরো কর্পোরেশন করে লাভ হলো না,' হতাশ কণ্ঠে বলল কিশোর। 'কাজকর্মই যদি পাওয়া না গেল, দরকারটা কি এ সবের?'

বই পড়ছে রবিন, কিশোরের শেষ কথাটা শুধু কানে গেল। 'কি সবের?'

হাই তুলে মুসা বলল, 'তারচেয়ে চলো, ম্যালিলা রিভারে গিয়ে মাছ ধরি। মাছ ধরা, পিকনিক, সময় কাটানো, সবই হবে।'

'কি নিয়ে কথা বলছ তোমরা, তাই তো বুঝতে পারলাম না,' আবার বলল রবিন।

'এই যে, কাজ নেই কর্ম নেই ওকিমুরো কর্পোরেশনের,' জবাব দিল মুসা, 'কিশোর আফসোস করছে...'

'এসে গেছে কাজ,' জানালার কাছ থেকে ঘোষণা করল ওমর। অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। রাস্তায় গাড়ি চলাচল দেখছিল চুপচাপ।

তিনজোড়া চোখ ঘুরে গেল ওর দিকে।

'মানে?' জানতে চাইল কিশোর।

'দুজন লোক ঢুকেছে গেট দিয়ে।'

'ও,' সামান্য উত্তেজনা যা-ও বা তৈরি হয়েছিল, নিমেষে উধাও

হয়ে গেল আবার কিশোরের। 'ইয়ার্ডে তো কত লোকই ঢোকে। মাল কিনতে এসেছে। কাস্টোমার।'

'না। বোরিসের সঙ্গে কথা বলল। আমাদের অফিসের দিকে দেখাল বোরিস। সোজা এখন আমাদের অফিসের দিকেই আসছে ওরা। একজন বয়স্ক। চুলের ছাঁট আর পোশাক দেখে নাবিক মনে হচ্ছে। সঙ্গের লোকটা তরুণ। চেনা চেনা লাগছে ওকে। কোথাও দেখেছি।'

'কোথায়?'

'মনে করতে পারছি না। আসুক। তারপর জিজ্ঞেস করব।'

জানালার কাছ থেকে সরে এসে ডেস্কের ওপাশে তার চেয়ারে বসে পড়ল ওমর। হাসিমুখে বলল, 'এসে গেছে আমাদের মক্কেল। কোন সন্দেহ নেই। কোথায় নিয়ে যেতে চায় আমাদের, সেটাই ভাবনার বিষয় এখন।'

'যেখানে খুশি নিক,' মুসা বলল। 'উত্তর মেরু বাদ দিয়ে পৃথিবীর আর যে কোন জায়গায় যেতে রাজি আছি আমি।'

'যদি কুমেরু হয়?' রবিনের প্রশ্ন।

'তাহলে তো আরও বাদ।'

'এই না বললে উত্তর মেরু বাদ দিয়ে পৃথিবীর যে কোন জায়গা।'

'খালি উকালতি প্যাঁচ। ধরে নিলেই তো হয়, উত্তর মেরুতেই যখন যেতে চাচ্ছি না, তারচেয়ে খারাপ কুমেরুতে যাব কেন?'

খোঁচা দিয়ে আরেকটা জবাব দিতে যাচ্ছিল রবিন, টোকা পড়ল দরজায়। ভারী কণ্ঠে জবাব দিল ওমর, 'আসুন।'

ঘরে ঢুকল দুজন লোক। অল্পবয়েসী লোকটা পরিচ্ছন্ন পোশাক

পরা। মোটামুটি সুদর্শন। বয়স্ক লোকটা তার চেয়ে খাটো, পেশীবহুল শরীর, মুখটা কেমন চারকোণা, ঝকঝকে নীল চোখ। গায়ে নীল জ্যাকেট, পিতলের বোতাম, মাথা থেকে খুলে হাতে নিয়েছে রঙচটা পীকড় ক্যাপটা।

চেয়ার দেখিয়ে ওমর বলল, 'বসুন; আমার নাম ওমর শরীফ। এরা আমার বন্ধু...কিশোর পাশা...মুসা আমান...রবিন মিলফোর্ড। আমাদের সঙ্গেই দেখা করতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে,' জবাব দিল তরুণ লোকটা। 'আমাকে কি আপনি চিনতে পারছেন, স্যার? আমি রোজার ক্যাম্পবেল। মিডল ইস্টের যুদ্ধে আমি আপনার স্কোয়াড্রনেই ছিলাম, ইরাককে কুয়েত থেকে সরাতে আমরা আমেরিকান এয়ারফোর্সে...মনে নেই?'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল ওমরের, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মরুভূমিতে বিমান নামাতে বাধ্য হয়েছিলাম আমরা। তুমি ছাড়া আরও নয়জন ক্রু ছিল। ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কেন কিছুতেই ধরতে পারছিলাম না। তেলের লাইনের খুঁতটা তুমিই খুঁজে বের করেছিলে...' উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল সে, 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ, কর্নওয়েল। চাকরি তো ছেড়ে দিয়েছ নিশ্চয়। সিভিলিয়ান লাইফ কেমন লাগছে?'

'ভাল না, স্যার, বড্ড একঘেয়ে। লস অ্যাঞ্জেলেসে একটা সাইকেলের দোকান দিয়েছি। চলে মন্দ না। কিন্তু এ কাজ কি আর ভাল লাগে? আমার দরকার ইঞ্জিন ঘাঁটাঘাঁটি। কোনমতে সময়গুলো পার করছি আরকি। টিকতে পারব বলে মনে হয় না। অন্য কিছু করতে না পারলে বেচেটেচে দিয়ে আবার হয়তো ফোর্সেই চাকরি নেব ভাবছি।'

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

'তাই?'

'হ্যাঁ। তবে আপনার কাছে চাকরির জন্যে আসিনি।' সঙ্গের বয়স্ক ভদ্রলোকের দিকে তাকাল রোজার, 'তুমিই বলো না, বাবা।' ওমরের দিকে ফিরল আবার। ভদ্রলোককে দেখিয়ে বলল, 'আমার বাবা, কর্নওয়েল ক্যাম্পবেল।'

তাঁর দিকে তাকাল ওমর, 'আপনি কি নেভিতে নাকি?'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন ক্যাম্পবেল, 'ছিলাম। এখনও নাবিকের পেশাটা ছেড়ে দিইনি, তবে বাণিজ্যিক জাহাজ চালাই। লস অ্যাঞ্জেলেসের ওয়াটারফ্রন্টে গিয়ে আমার নাম 'জাম্বু ক্যাম্পবেল' বললে একনামে চিনবে সবাই।'

'জাম্বু কেন?'

হাসলেন ভদ্রলোক। 'চিড়িয়াখানার জন্যে ইনডিয়া থেকে জাহাজে করে একটা হাতি আনার দায়িত্ব পড়েছিল আমার ওপর। কখনও জাহাজে ওঠেনি হাতিটা। সাগরের দুলুনি শুরু হতেই খেপে গেল। কেউ আর সামলাতে পারে না। শেষে আমি গিয়ে সামলালাম, কোন অঘটন না ঘটিয়ে নিরাপদে আমেরিকায় নিয়ে এলাম ওটাকে। সেই থেকে আমি জাম্বু।'

হাসল ওমর। 'তা এবার কি সমস্যা? ডাইনোসর আনার দায়িত্ব পড়েছে নাকি?'

'সেটা হলেও আমি একাই পারতাম, আপনার সাহায্যের প্রয়োজন পড়ত না।' দ্বিধা করতে লাগলেন ক্যাম্পবেল।

'তবে কোন্ জানোয়ার? ডাইনোসরের চেয়ে বড় কিছু আছে বলে তো শুনিনি।'

'না, জানোয়ার-টানোয়ার না।' ছেলের দিকে তাকালেন ক্যাম্পবেল। আবার ফিরলেন ওমরের দিকে। 'সে অনেক কথা,

লম্বা কাহিনী।'

'নিশ্চিন্তে বলতে পারেন। আমাদের কোন তাড়া নেই।'

'ইয়ে...একগাদা টাকা পড়ে আছে এক জায়গায়...শুধু তুলে নেয়ার অপেক্ষা।'

আস্তে মাথা ঝাঁকাল ওমর। 'বুঝেছি। গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছেন। তুলে আনতে যেতে চান।'

'অনেকটা সেরকমই।'

'আমাকে কি দরকার?'

আবার দ্বিধায় পড়ে গেলেন ক্যাম্পবেল। 'আপনাকে ছাড়া হবে না।...আমি একা পারব না...'

ছেলে সাহায্য করল বাবাকে। তাঁর হয়ে ওমরকে বলল, 'আপনার কাছে পরামর্শের জন্যে এসেছি, স্যার। কার কাছে যাব ভাবতে প্রথমেই মনে এল আপনার কথা।'

চোখের পাতা সরু করে ফেলল ওমর, 'পরামর্শ মানে কি, সাহায্য?'

শুকনো ঠোঁটে জিভ বোলাল রোজার। 'অনেকটা তাই।'

'গুপ্তধন খুঁজতে গেলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিফল হয়ে ফিরে আসতে হয়, নিশ্চয় জানো সেটা।'

'জানি, স্যার। তবে আর কিছুই না পেলেও মজা তো পাওয়া যায়।'

'মজাটা পেতে বড় বেশি টাকা খরচের প্রয়োজন হয়,' ড্রয়ার থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ক্যাম্পবেলের দিকে বাড়িয়ে ধরল ওমর। মাথা নাড়লেন তিনি। একটা সিগারেট নিয়ে টেবিলে মাথা ঠুকতে লাগল সে। 'যাকগে। কোথায় আছে এই গুপ্তধন?'

প্রায় মিনমিন করে ক্যাম্পবেল বললেন, 'দক্ষিণ মেরুর কাছে।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। চট করে তাকাল রবিনের দিকে। মুচকি হাসল রবিন।

বাংলা বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকালেন ক্যাম্পবেল, 'কি বলল ছেলেটা?'

'না, কিছু না,' ওমর বলল। 'আপনি ভুল করছেন না তো? কোন্ পাগলে ওই বরফের মধ্যে সোনা লুকাতে যাবে?'

'সোনার তাল কিংবা বার নয়,' গলায় জোর নেই ক্যাম্পবেলের। 'তবে সোনার জিনিসই।'

'কি? মোহর?'

'না, মুকুট।'

'কি!'

'মুকুট। সোনার মুকুট, হীরা বসানো।'

ভ্রূকুটি করল ওমর। 'কুমেরুতে মুকুট! সত্যি! আপনি দেখেছেন?'

'না।'

'তাহলে জানলেন কি করে?'

'জানি।'

'এখনও আছে ওখানে?'

'হীরা আছে কিনা জানি না, তবে...'

কথাবার্তা যে ভাবে এগোচ্ছে, ছেলের সেটা ভাল লাগল না; বলল, 'খুলে বলো না সব, বাবা।'

তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাল ওমর। আগ্রহী হয়ে তাকিয়ে আছে তিনজনেই। আবার ক্যাম্পবেলের দিকে ফিরল সে। 'বলুন।'

পকেট থেকে পুরানো চেহারার রূপার ব্যান্ড লাগানো একটা পাইপ বের করলেন ক্যাম্পবেল। কালো রঙের এক কয়েল ব্ল্যাক

প্লাগ টোবাকো থেকে ভয়ঙ্কর দর্শন একটা ছুরি দিয়ে কয়েক টুকরো কেটে নিলেন। পাইপে ঠেসে ভরলেন সেগুলো। বড় একটা তামার লাইটার দিয়ে আগুন ধরালেন তাতে। জোরে টেনে নাকমুখ দিয়ে গলগল করে এত বেশি নীলচে ধোঁয়া বের করতে লাগলেন, মনে হলো তাঁর ভেতরে আগুন ধরে গেছে। আর সেই ধোঁয়ার যা দুর্গন্ধ, সিগারেট আর চুরুটখেকো ওমরও সহ্য করতে পারল না। কাশতে লাগল।

'হ্যাঁ, এইবার হয়েছে,' উজ্জ্বল হলো ক্যাম্পবেলের মুখ। মিনমিনে ভাবটা চলে গিয়ে গড়গড় করে কথা বেরিয়ে এল, দ্বিধা নেই আর, 'বাড়ি ফেরার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, বুঝলেন, হংকং বন্দরে। জাতে নাবিক, টাকা খরচ করে টিকেট করব কেন? তারচেয়ে একটা জাহাজ খুঁজছিলাম, যেটা আমেরিকায় আসবে; তাতে চাকরি নিলে দেশে ফেরা হবে, নগদ টাকা বাঁচবে, উপরি কিছু আয়ও হবে। বন্দরে আমাকে খোঁজ-খবর নিতে দেখে পোত্রাঘাই নামে একটা লোক এসে দেখা করল আমার সঙ্গে। কত দেশে ঘুরেছি, বিদঘুটে নাম বহু শুনেছি, কিন্তু এমন অদ্ভুত নাম শুনিনি। এ নামের মানেটা যে কি তা-ও জানি না। সুতরাং কোন্ দেশের লোক বুঝতে পারলাম না। সে-ও বলল না। ভাল ইংরেজি বলতে পারে, চেহারাও ফর্সা, কিন্তু ইংরেজ নয়। আমার কৌতূহল দেখে জানাল, অস্ট্রেলিয়ান, তবে বিশ্বাস হলো না আমার। হংকঙের জাপানীদের সঙ্গে তার বেশ খাতির দেখলাম। ও বলল, তার একটা জাহাজ আছে, চিলির এক কোম্পানির কাছে বিক্রি করেছে, সেটা সান্তিয়াগো বন্দরে পৌঁছে দিতে হবে। বিশ্বাস করলাম তার কথা। না করার কোন কারণ ছিল না। পরে জেনেছি, সব মিথ্যে। আমার সঙ্গে যাত্রী হিসেবে আসতে চাইল সে।

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

জাহাজের মালিককে সঙ্গে না নেয়ার কোন যুক্তি দেখলাম না আমি। তখনও জাহাজটা দেখিনি। দেখতে গিয়ে অবাক। ওটা জাহাজ না জাহাজের অ্যানটিক বোঝা কঠিন। নাম বেত্রাঘাই…'

ফিকফিক করে হেসে ফেলল মুসা, 'বেত্রাঘাত রাখলে ভাল করত, মানে হতো।'

ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকালেন আবার ক্যাম্পবেল। ওমরের দিকে ফিরলেন। 'কি বলল?'

'না কিছু না, বাংলা বলেছে। মুসা, একটু চুপ থাকো না। শুনি।' এ কথাটা ইংরেজিতে বলল ওমর, যাতে ক্যাম্পবেল বুঝতে পারেন।

লজ্জিত হলো মুসা। চুপ হয়ে গেল। রবিনের মুখেও হাসি ফুটেছিল, মিলিয়ে গেল।

'নিশ্চয় বেত্রাঘাই নিয়ে রসিকতা করছে,' ক্যাম্পবেল বললেন। 'করবেই। নাম শুনে আমার তো রাগই লাগছিল। পোত্রাঘাইয়ের জাহাজ বেত্রাঘাই একটা ড্যানিশ জাহাজ, আগে নিশ্চয় অন্য নাম ছিল, বদলে ফেলেছে। ইটালিয়ান ইঞ্জিন। দুটো ইঞ্জিনের একটা পুরোপুরি বন্ধ, আরেকটা কোনমতে ধুকধুক করে চলে। দেখে মনে হলো যে কোনও সময় জাহাজের তলা খসিয়ে দিয়ে পানিতে পড়ে যাবে। আমার কালো মুখ দেখে সান্ত্বনা দিল পোত্রাঘাই, কোন চিন্তা নেই, তার জানা একজন ভাল ইঞ্জিনিয়ার আছে, স্কটল্যান্ডে বাড়ি। কথার ভঙ্গিতে মনে হলো, স্কটল্যান্ডে বাড়ি হলেই যেন আর কোন চিন্তা নেই, দুনিয়ার যে কোন বাতিল ইঞ্জিন মেরামত করে ফেলতে পারবে। মানা করে দেব কিনা ভাবছিলাম; আমার মনের ভাব টের পেয়েই যেন মোটা টাকা বেতনের কথা শুনিয়ে দিল পোত্রাঘাই। টাকার অঙ্ক শুনে শেষে রাজি হয়ে গেলাম। ভাবলাম,

যা হয় হোকগে, ভাঙা জাহাজ হলো তো আমার কি? আস্তে চলবে, বাড়ি ফিরতে কয়েক দিন দেরি হবে, এর বেশি কিছু না। আমারও তাড়া ছিল না তেমন…'

টান না দিতে দিতে পাইপটা যে নিভে গেছে এতক্ষণে খেয়াল করলেন ক্যাম্পবেল। জ্বেলে নিয়ে আবার শুরু করলেন, 'দিন বিশেক পর যাত্রা শুরু হলো আমাদের। নাবিক জোগাড় করেছিল বটে পোত্রাঘাই একদল–দুনিয়ার হেন ভাষা নেই, আর হেন চামড়ার রঙ নেই, যেটা সে জাহাজে তোলেনি। বন্দরের কাছাকাছি যতগুলো ক্রিমিন্যালকে কুড়িয়ে পেয়েছে, সব তুলে নিয়েছিল সে। এ নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা ছিল না। আমার গুরু ছিলেন জলদস্যুর বংশধর, তাঁর কাছে শিখেছিলাম কোন্ চরিত্রের মাল্লাকে কিভাবে ঠাণ্ডা করে রাখতে হয়। জাহাজে একটা লোকের ওপরই বিশ্বাস ছিল, আমার চীফ ইঞ্জিনিয়ার স্টো জনহাওয়ার, সেই স্কট ইঞ্জিনিয়ার, বাস্তবিকই লোকটা ভাল ছিল। দুজন জাপানীকেও জাহাজে তুলেছিল পোত্রাঘাই, ওরা নাকি দক্ষিণ আমেরিকায় যেতে চায়। বন্দর ছেড়ে বহুদূরে সরে আসার আগে আমি ওদের কথা জানতেই পারিনি। বন্দরে দেখলে হয় ওদের নামিয়ে দিতাম নয়তো আমি নেমে যেতাম, এটা বুঝেই হয়তো খোলের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল পোত্রাঘাই। খোলা সাগরে এসে বেরোল ওরা, আর বেরিয়েই আমার জান কাবার করা শুরু করল। এমন করে হুকুম দিতে শুরু করল, যেন ওরাই জাহাজটার আসল মালিক। রাগ আরও বেশি লাগল, যখন দেখলাম পোত্রাঘাই কিছুই বলছে না ওদের। এতটাই খটমটে নাম ওদের, উচ্চারণ করতে পারি না; কাছাকাছি যেটা পারি তা হলো মেডিয়া আর বোকাওয়া। আমি আরও সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছিলাম, মেডি আর বোকা…'

ahmsumon@yahoo.com ©
www.murchona.com

বাংলায় শব্দগুলোর মানে কি হয় ভেবে হেসে ফেলল মুসা। ক্যাম্পবেল তাকাতেই হাসি চাপার চেষ্টা করল। রবিন আর কিশোরের মুখেও হাসি। এবার আর 'কিছু না' বলে চাপা দেয়ার চেষ্টা করল না ওমর। ইংরেজিতে বলে বুঝিয়ে দিল দুই জাপানী 'ভদ্রলোকের' সংক্ষিপ্ত নামের বাংলা মানে কি হয়। শুনে হেসে ফেলল রোজার। ক্যাম্পবেল মুখটাকে গম্ভীর বানিয়ে রাখলেও মনে মনে যে হাসছেন, বোঝা যায়।

'তো যাই হোক,' আগের কথার খেই ধরলেন তিনি, 'শুরুতে অতি সাধারণ একটা সাগরযাত্রাই মনে হলো। চমৎকার আবহাওয়া, সব কিছু ঠিকঠাকমত চলছিল। তারপর জাহাজের যাত্রাপথের দিকে নজর দিল পোত্রাঘাই। গোলমালটা শুরু হলো যখন গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। ব্রিজে এসে আমার সঙ্গে দেখা করল সে, বলল নতুন কোর্স ঠিক করে দক্ষিণে মুখ ঘুরিয়ে দিতে। কেন, জানতে চাইলাম। বলল, মালিকরা আগে গ্র্যাহাম ল্যান্ডে যেতে চাইছেন। চমকে গেলাম। বলে কি! গ্র্যাহাম ল্যান্ডের বরফের মধ্যে গিয়ে কি করবে? পোত্রাঘাই বলল, সেটা ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আরও বলল, অত কথায় কাজ নেই আমার, বাড়তি কাজের জন্যে বাড়তি পয়সা দেয়া হবে। টাকার কথা বলে আর নরম করতে পারল না আমাকে। বিপদের গন্ধ পেলাম। নিচে গিয়ে জনের সঙ্গে কথা বললাম। লক্ষ করলাম, প্রতিটি চোখ নজর রেখেছে আমাদের ওপর। মনে হলো, জাহাজে সবাই জানে, একমাত্র আমরা দুটি লোকই কেবল গ্র্যাহাম ল্যান্ডে যাওয়ার কারণ জানি না। বুঝলাম, রাজি না হয়ে উপায় নেই; যেতে না চাইলেও যেতে বাধ্য করবে ওরা আমাদের। তখনকার মত চুপ হয়ে গেলাম। তবে গোপনে লগবুকে লিখে রাখলাম : জোর করে নিয়ে

যাওয়া হচ্ছে আমাদের।

'লম্বা কাহিনী খাটো করি। পনেরো দিন পর বেলিংশাউজেন সী'র বড় বড় আইসবার্গ আর ভাসমান পাথরের চাঁইয়ের মাঝখান দিয়ে পথ করে চলল জাহাজ। তারপর যখন মেরুর বরফ বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আটকে দিল, ব্যঙ্গ করে পোত্রাঘাইকে বললাম, "তারপর? বরফের দৃশ্য দেখা শেষ হলো?" ও চুপ করে থেকে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। ভয়ানক বিপজ্জনক জায়গা ওটা; বরফের ভাসমান চাঁইয়ের মাঝে যদি কোনভাবে পড়ে যায় জাহাজ, আর দুদিক থেকে এসে চাপ দেয় ওগুলো, দেশলাইয়ের বাক্সের মত চ্যাপ্টা হয়ে যাবে।'

অতীত কথা মনে করে রাগ কমানোর জন্যেই যেন জোরে জোরে পাইপের তামাক খোঁচাতে শুরু করলেন তিনি। আগুনটা উস্কে দিলেন।

'ওদের উদ্দেশ্যটা বুঝতে সময় লাগল না আমার,' বললেন তিনি। 'সীল। সীল পোচিং। বেআইনী ভাবে সীল শিকার করতে গিয়েছে। এ সব প্রাণীহত্যার ব্যাপারগুলো মোটেও ভাল লাগে না আমার। ভীষণ বিরক্ত হয়ে ঝগড়া বাধালাম পোত্রাঘাইয়ের সঙ্গে। তার দুই জাপানী সাঙ্গাত আর দলবলকে জাহান্নামে যেতে বললাম। কিন্তু যত প্রতিবাদই করি না কেন, জাহাজের সবার বিরুদ্ধে আমাদের দুজনের কিছুই করার ছিল না। তবে এটাও জানতাম, আমাকে আর জনকে ছাড়া ওরাও অচল। শিকার করা জানোয়ার বিক্রির টাকা থেকে ভাগ দেয়ার লোভ দেখাল আমাকে পোত্রাঘাই। কানেও তুললাম না। উল্টো হুমকি দিলাম, বাড়ি ফিরে গিয়েই পুলিশের কাছে রিপোর্ট করব। এই কথাটা বলেই করেছিলাম মস্ত ভুল। তখনকার মত চুপ হয়ে গেল পোত্রাঘাই।

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

তবে ওদের শিকার বন্ধ করতে পারলাম না।

'একদিন সীল শিকার করতে গিয়ে ঘণ্টা দুই পরে খালি হাতে ফিরে এল ওরা। মুখ দেখেই বুঝলাম কিছু একটা ঘটেছে। উত্তেজনায় ফুটছে সব ক'জন। ভূতের মত সাদা হয়ে গেছে চেহারা। চোখে কেমন বুনো দৃষ্টি। কি দেখেছে জিজ্ঞেস করলাম। বলল, পুরানো একটা জাহাজ। জানতে চাইলাম, দামী কিছু আছে নাকি ভেতরে। বলল, না। নামটা কি জিজ্ঞেস করলাম, লগবুকে লিখে রাখার জন্যে। বলল, বরফে ঢেকে গেছে, পড়া যায় না। বুঝলাম, মিথ্যে কথা বলছে। জাহাজটাতে কি পেয়েছে ওরা সেটা জানার জন্যে ভীষণ কৌতূহল হলো আমারও। নেমে গেলেই দেখতে পারতাম, কিন্তু আবহাওয়া তখন সাংঘাতিক খারাপ হয়ে উঠেছে। ভয়াবহ তুষার ঝড়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। বাতাসে দ্রুত ঠেলে আনছিল ভাসমান আইসবার্গগুলোকে। ওগুলোর মাঝে আটকে গেলে আর বেরোনো লাগত না। জাহাজসুদ্ধ লোক সব মারা পড়তাম। তাড়াতাড়ি আমাকে জাহাজ ছাড়ার নির্দেশ দিল পোত্রাঘাই, যদিও ওখান থেকে সরার একবিন্দু ইচ্ছে ছিল না তার। আমিও ছাড়ার জন্যে তৈরি হয়েই ছিলাম। বলার সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলাম।'

'সঙ্গে করে জাহাজের একটা জিনিসও আনেনি ওরা?' জানতে চাইল ওমর।

'না।'

'কিন্তু দামী কিছু পেলে তো ফেলে আসার কথা নয়, ওদের যা স্বভাব।'

'এইটাই তো হলো কথা। সহজে আসার মত হলে না এনে ছাড়ত না। নিশ্চয় বড় কিছু, কিংবা এমন কিছু যা আনতে সময়

লাগে, ঝড় এসে যাওয়াতে সে-সময়টা আর পায়নি পোত্রাঘাই। আটকা পড়ে মরার ভয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল।

'যাই হোক, কয়েক রাত পর ভীষণ উত্তেজিত হয়ে জন এসে ঢুকল আমার কেবিনে। বলল, "জানেন ভাঙা জাহাজটায় কি পেয়েছে ওরা? সোনার মুকুট, হীরা বসানো।" জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি জানলে কি করে?" জবাব দিল, 'পোত্রাঘাইয়ের কেবিনের দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে ছিল, ভেতরের কথা শোনা যাচ্ছিল। জাপানী ভাষায় কথা বলছিল। কিছু কিছু বুঝি আমি। তাতেই বুঝলাম, মুকুটের কথা বলছে ওরা।"

'কিন্তু এরও তো মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না,' ওমর বলল। 'মেরু অঞ্চলে মুকুট নিয়ে যাবে কে? আর যদি কোন কারণে গিয়েও থাকে খোয়া গেলে সেটা গোপন থাকত না, সারা দুনিয়া জেনে যেত। রেফারেন্স বইতে থাকতই। কুমেরুতে কোন বিখ্যাত মুকুট খোয়া গেছে বলে শুনিনি। জনের জানার মধ্যে কোন ভুল ছিল না তো?'

দ্বিধা করলেন ক্যাম্পবেল। 'উঁহু। ও জাপানী শব্দের যা মানে করল, তাতে হয় "স্টারস অ্যান্ড ক্রাউন"। ওর মতে স্টারস মানে হীরা ছাড়া আর কিছু না।'

গভীর মনোযোগে শুনছিল কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে অদ্ভুত হয়ে উঠল চেহারার ভঙ্গি। প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'এক মিনিট, এক মিনিট! স্টারস অ্যান্ড ক্রাউন, তাই না? কোথাও শুনেছি। যাকগে, ভাবতে থাকি। মিস্টার ক্যাম্পবেল, আপনি বলে যান।'

কিশোরের এ ধরনের দুর্বোধ্য আচরণের সঙ্গে পরিচিত নন

annsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

ক্যাম্পবেল। অবাক হলেন। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে থেকে যেন বোঝার চেষ্টা করলেন ছেলেটা পাগল কিনা। তারপর বললেন, 'যতই বাড়ির কাছাকাছি হচ্ছিলাম ততই কেমন যেন একটা চাপা অস্বস্তি চেপে ধরছিল আমাকে, জাহাজের পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণেই হচ্ছিল এটা। একটা কথা বলে রাখি, বাড়ি মানে ওদের বাড়ি, আমার নয়; আমাকে হংকঙে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল ওরা। যা-ই হোক, যে দেশের বন্দরই হোক, আমি তখন মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম লোকালয়ে পৌছানোর জন্যে। পোত্রাঘাই আর তার দুই সাঙ্গাত পারতপক্ষে আমার সামনে পড়ত না, অন্যান্য নাবিকেরাও জটলা বেঁধে ফিসফাস করত, আমাকে দেখলেই চুপ। শেষে আর থাকতে না পেরে জনকে বললাম, "জন, আমার সন্দেহ হচ্ছে, ওরা আমাদের খুন করতে চায়। আমাদের বিশ্বাস করে না ওরা। যদি তীরে নেমে ওদের কুকর্মের কথা সব বলে দিই, সেজন্যে মুখ বন্ধ করা জরুরী। তুমি সাবধানে থেকো।" আমার সন্দেহ পুরোপুরি ঠিক ছিল। বন্দরে পৌছার আগের রাতে ইঞ্জিন রুম থেকে এক ফাঁকে এসে আমাকে বলে গেল জন, "ডেকে থাকবেন। আমি আসছি। জরুরী কথা আছে।" ওর চোখেমুখে উত্তেজনা আর ভয় দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু আর আসতে পারেনি ও। কয়েক মিনিট পর পানিতে ভারী কিছু পড়ার শব্দ শুনলাম। ভাবতেই পারিনি তখন, জনকে ফেলে দিয়েছে ওরা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন এল না সে, টনক নড়ল আমার। নিচে নামলাম। কোথাও পেলাম না ওকে। ওর কেবিনেও না। কাউকে জিজ্ঞেস করে কোন জবাব পেলাম না। বুঝলাম, এর পরেই আমার পালা। সোজা গিয়ে ঢুকলাম নিজের কেবিনে। টাকা-পয়সা আর অতি প্রয়োজনীয় টুকিটাকি দু'চারটা জিনিস

পকেটে ভরলাম। পিস্তলটা হাতে নিয়ে ডেকে বেরোতেই দেখি ওরা হাজির। একটা মাত্র পিস্তল দিয়ে জাহাজ ভর্তি লোকের সঙ্গে লড়াই করে পারব না। গোটা দুই গুলি চালিয়ে সামনে থেকে ওদের সরিয়ে দিয়ে সোজা গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম পানিতে। গলাকাটা অবস্থায় পড়ার চেয়ে ওভাবে পড়াটা ভাল মনে করেছিলাম। খুব ভাল সাঁতার জানি। গাঢ় অন্ধকারেও অসুবিধে হলো না আমার। তীর কোনদিকে অনুমান করে সাঁতরে চললাম। বন্দরে পৌছে জাহাজটাকে দেখলাম না। বিদেশ-বিভুঁই। কাউকে কিছু বলতে গিয়ে আবার কোন্ বিপদে পড়ি, এ ভয়ে মুখ বন্ধ রাখলাম। টাকা বাঁচানোর কিপটেমির মধ্যে আর গেলাম না। একটা যাত্রীবাহী জাহাজের টিকেট কেটে সোজা দেশে ফিরে এলাম।'

পাইপের পোড়া তামাক ঝেড়ে ফেলে পাইপটা পকেটে রেখে দিলেন ক্যাম্পবেল। পাশে বসা রোজারের দিকে মাথা নেড়ে বললেন, 'বাড়ি ফিরে ছেলেকে সব বললাম। সে-ই আমাকে পরামর্শ দিল আপনাকে জানাতে, যাতে জাহাজের দামী মালগুলো উদ্ধারের একটা ব্যবস্থা করা যায়। বললাম, যাব কি করে? ছেলে বলল, সে-কথা ভাবার ভারও আপনার ওপর ছেড়ে দিতে। আপনার ওপর ভরসা খুব বেশি ওর। তো, আপনি কি এমন কাউকে চেনেন, যিনি এ কাজে আমাদের সহায়তা করতে পারবেন?'

হালকা এক চিলতে হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল ওমরের ঠোঁটে, 'হুঁ!'

'একটা কথা নিশ্চিত করে বলতে পারি আপনাকে,' ক্যাম্পবেল বললেন, 'মুকুটটা আনতে পারেনি পোত্রাঘাই।'

amisuman@yahoo.com
www.murchona.com

'আমিও জানি,' যেন ঘোরের মধ্যে থেকে বলে উঠল কিশোর।

ওর দিকে ফিরে তাকালেন বিস্মিত ক্যাম্পবেল। 'তুমি জানো মানে?'

'জানি, তার কারণ,' ধীরে ধীরে বলল কিশোর, 'মুকুটটা এত বড় আর ভারী, বয়ে আনা সম্ভব ছিল না ওদের পক্ষে।'

দুই

কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্যাম্পবেল। ছেলেটা সত্যি সত্যি পাগল কিনা, আরেকবার বোঝার চেষ্টা করছেন যেন। 'তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারছি না। মাথায় পরার একটা সোনার মুকুট যত বড়ই হোক, কত আর বড় হবে? একজনের পক্ষেই বয়ে আনা সম্ভব। লুকিয়ে আনার ইচ্ছে থাকলে...'

'মজাটা তো ওখানেই,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর, 'মুকুটটা আদৌ সোনার তৈরি নয়। কাঠের তৈরি।' ক্যাম্পবেলের হাঁ হয়ে যাওয়া মুখের ফাঁকটাকে আরেকটু বাড়িয়ে দিতেই যেন রহস্যময় হাসি হাসল সে। 'ক্যাপ্টেন, আমার ধারণা যদি ভুল না হয়ে থাকে তো যে জাহাজটাকে খুঁজে পেয়েছে ওরা, সেটার নাম স্টারি ক্রাউন।'

কিশোরের কথা শেষ হওয়ার পরেও পুরো পাঁচ সেকেন্ড তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্যাম্পবেল। তারপর ওমরের দিকে

ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলেটা কি সব সময় এ ভাবেই রহস্য করে কথা বলে নাকি?' ওমরের মুচকি হাসি দেখে মাথা ঝাঁকালেন। আবার ফিরলেন কিশোরের দিকে। 'ওরকম কোন জাহাজের নাম জীবনেও শুনিনি।'

'খুব অল্প লোকেই জানে ওটার নাম,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'আমি জানি, তার কারণ অব্যাখ্যাত রহস্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা আমার পছন্দ। এ সম্পর্কে যত লেখা আমি পেয়েছি, সব পড়েছি। বহুকাল আগে, আমার দাদার-বাবার বয়েস যখন আমার চেয়ে কম ছিল...'

'দাদার-বাবার বয়েস তোমার চেয়ে কম ছিল মানে?'

'মানে আমার এখনকার বয়েসের চেয়ে কম ছিল।'

'ও,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মনে হলো ক্যাম্পবেল।

'ওই সময় জাহাজটা অস্ট্রেলিয়া থেকে লন্ডন রওনা হয়েছিল।'

'তার মধ্যেই ছিল নাকি মুকুটটা?'

'না, মুকুট-টুকুট কিছু ছিল না।'

'মার্লিন মারার স্পাইক দিয়ে আমার মাথায় একটা বাড়ি মারো!' তিক্ত শোনাল ক্যাম্পবেলের কণ্ঠ। 'আমি কোথায় ভেবে বসে আছি বিরাট সম্পদ লুকিয়ে আছে দক্ষিণ মেরুতে, তুলে আনার অপেক্ষায়, তা না, একটা সাধারণ কাঠের জাহাজ...ধুর!'

হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। 'আপনার ধারণায় এক বিন্দু ভুল নেই।'

'ছেলেটা আমাকে সত্যি সত্যি পাগল করে দেবে!' দুই হাতে মাথা চেপে ধরলেন ক্যাম্পবেল। 'যা বলার খোলাখুলি বলো না! এত নাটক করছ কেন?'

চট করে মুসার দিকে তাকাল রবিন। দেখল, মুসাও হাসছে

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

নীরবে।

হাসিটা মুছল না কিশোরের। বলল, 'আমি ভেবেছিলাম স্টারি ক্রাউন নামটা বললেই সব বুঝতে পারবেন। যাকগে, সবাই তো আর চট করে সবকিছু বোঝে না। বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপনার ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু স্টার শব্দটা শুনেছেন, আর ক্রাউন। ঠিকমত ভাষা না বুঝলে যা হয়, অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী, তাঁর হয়েছিল তা-ই। ক্রাউনের মানে জানা ছিল, মুকুট, তাতে স্টার অর্থাৎ হীরা বসিয়ে মনে মনে দিব্যি একখান মুকুট তৈরি করে নিয়েছিলেন। আসলে ওরা বলাবলি করছিল স্টারি ক্রাউন জাহাজটার কথা।

'রওনা দেবার সময় স্টারি ক্রাউনের খোলে ছিল এক টন অস্ট্রেলিয়ান গোল্ড–এখন অবশ্য কতটা অবশিষ্ট আছে, নাকি তলা ফেটে পানিতে পড়ে গেছে, বলতে পারব না। পনেরোশো টনের স্কুনার জাতীয় জাহাজ ওটা। মেলবোর্ন থেকে লন্ডন যাবার পথে সমস্ত সোনা নিয়ে গায়েব হয়ে যায়। একজন নাবিকেরও বেঁচে থাকার খবর পাওয়া যায়নি, কারও কোন হদিসই পাওয়া যায়নি আর জাহাজটা হারিয়ে যাওয়ার পর। বীমার টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বিশ বছর পরে সোর্ডফিশ নামে একটা তিমি শিকারীর জাহাজ স্টারি ক্রাউনকে আটকে থাকতে দেখে দক্ষিণ মেরুর বরফে। দুর্ঘটনায় পড়েছিল সোর্ডফিশ। সব নাবিক মারা গিয়েছিল ওটার, একজন বাদে, তার নাম লার্স্ট। বছর পঞ্চাশেক আগে অস্ট্রেলিয়ায় মারা গেছে সে। বাড়ি ফেরার পরে তার এক বন্ধু ম্যানটনকে বিশ্বাস করে জানিয়েছিল সব কথা। সেই বন্ধু ছিল ব্ল্যাকডগ নামে একটা স্কুনারের মালিক। সোনার লোভ বড় সাংঘাতিক। লার্স্ট আর ম্যানটন বেরিয়ে পড়ল গুপ্তধন উদ্ধারে। কুমেরুতে গিয়ে এই জাহাজটাও দুর্ঘটনায় পড়ল। দুটো সচল

আইসবার্গের মাঝে পড়ে চাপ খেয়ে চিড়েচ্যাপ্টা হলো। জাহাজের সমস্ত লোক মারা গেল, দুজন বাদে, লার্স্ট আর ম্যানটন। আগেই তীরে নেমে পড়েছিল ওরা। তীর মানে, বরফের ওপর। হেঁটে পৌছল ওরা স্টারি ক্রাউনের কাছে। জাহাজটাকে যেমন দেখে গিয়েছিল লার্স্ট, তেমনই ছিল তখনও। সোনাগুলোও ছিল। কিন্তু সোনা দিয়ে আর কি করবে ওরা? কুমেরুতে বন্দি তখন। বেরোনোর সামান্যতম আশা নেই। স্টারি ক্রাউনের গুদামে খাবার ছিল। ঠাণ্ডার কারণে নষ্ট হয়নি। খাবার থাকাতে বেঁচে গেল ওরা। সময় কাটানোর জন্যে সোনা ভাগাভাগি করত নিজেদের মধ্যে। কয়েক মাসের মধ্যে ভয়াবহ নিঃসঙ্গতায় পাগল হয়ে গেল ম্যানটন। লার্স্টকে খুন করার চেষ্টা করল। কিন্তু আত্মরক্ষা করতে গিয়ে লার্স্টই খুন করে বসল ম্যানটনকে। অনুশোচনা হতে লাগল। বরফের মধ্যে কবর দিল বন্ধুকে। নিঃসঙ্গতায় পাগল হয়ে ধুঁকে মরার চেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল। তবে তার চেষ্টাটা একটু বিচিত্র। স্টারি ক্রাউনে ছোট একটা নৌকা ছিল। সেটা মেরামত করে নিল। একটা স্লেজ বানাল। নৌকাটাকে স্লেজে তুলে তাতে কিছু খাবার-দাবার নিল। তারপর বসন্তকালে যখন বরফ ভাঙতে আরম্ভ করল, স্লেজটাকে টেনে নিয়ে রওনা হলো। পানির কিনারে পৌছে নৌকা ভাসিয়ে তাতে চেপে বসল। মরল না ও। স্প্রে নামে একটা আমেরিকান তিমি শিকারীর জাহাজ ওকে দেখতে পেয়ে তুলে নিল। এত ভোগান্তির পরও সোনার লোভ ছাড়তে পারেনি লার্স্ট। কি করে গিয়েছে ওখানে, বানিয়ে বানিয়ে একটা গল্প শুনিয়ে দিল। বাড়ি ফিরল সে। কিন্তু এত ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে, পুরোপুরি সুস্থ হতে পারল না আর। কয়েক মাসের মধ্যেই মারা গেল। মরার আগে তার এক আত্মীয়কে জানিয়ে গিয়েছিল

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

সোনার খবর। সেই আত্মীয় তার এক বন্ধুকে বলল, বন্ধু বলল আরেক বন্ধুকে। ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না। সোনার গল্পটাকে পাগল হয়ে যাওয়া লার্টের প্রলাপ বলে ধরে নিল অনেকেই। যারা বিশ্বাস করল, তারাও আনতে যাওয়ার ঝুঁকি নিল না। সোনা আনতে গিয়ে মরার চেয়ে যেভাবে আছে সেভাবেই বেঁচে থাকাটা ভাল মনে করল ওরা। এরপর ওই সোনা উদ্ধারের আর কোন চেষ্টাই কেউ করেনি কখনও।' ক্যাম্পবেলের দিকে তাকাল কিশোর। 'জাহাজটা যদি আগের মতই এখনও বরফে আটকা পড়ে থাকে, ধরে নেয়া যায় সোনাগুলো আছে ওর মধ্যে। ওগুলো না দেখলে অতটা উত্তেজিত হতো না পোত্রাঘাই। সোনার বার অতিরিক্ত ভারী, আর বরফের ওপর দিয়ে বয়ে আনাটা সময়সাপেক্ষ। ওসব কোন কিছুকেই পরোয়া করত না ওরা, নিয়ে আসতই; তুষার ঝড় আর আইসবার্গ বাদ না সাধলে।'

'লার্ট আসার সময় সোনা আনেনি?' জানতে চাইল ওমর।

'মনে তো হয় না। যুক্তি কি বলে? আপনি যদি ওর অবস্থায় পড়তেন, কি করতেন? অহেতুক বাড়তি ওজন বহনের কষ্ট করতে চাইতেন? তা ছাড়া এমনিতেই যেখানে প্রাণের ঝুঁকি, সেখানে প্রাণ বাঁচানো ছাড়া ওই মুহূর্তে তখন আর কোন কিছুর কথা ভাববে না কোন মানুষ। আনেনি। আনলে জানাজানি হয়ে যেত। তিমি শিকারীদের নজরে পড়ত ওই সোনা। বেহুঁশ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করেছিল ওরা।' ক্যাম্পবেলের দিকে ফিরল সে। 'জাহাজটার পজিশন নোট করে নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'পোত্রাঘাইকে বলেছেন?'

'না।'

'কিন্তু লগবুক থেকে সে জেনে নিতে পারে, তাই না?'

'খুব সহজে।'

'বরফ তো নড়াচড়া করে, বিশেষ করে বসন্তে ভাঙা শুরু হলে। জাহাজটার অবস্থান সরে যেতে পারে না?'

'তা তো পারেই। কিন্তু এত বছরে যখন সরেনি—কিংবা সরলেও আমাদের জানার কথা নয়—না সরার সম্ভাবনাই বেশি। হয়তো মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে আটকানো বরফে আটকা পড়েছে ওটা। একটা কথা ঠিক, কুমেরুতে যত বরফই থাক, তলায় কোথাও না কোথাও মাটি আছেই।'

খস করে দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাল ওমর। 'তারমানে সোনাগুলো এখনও আগের জায়গাতেই আছে, যদি ইতিমধ্যে পোত্রাঘাইরা গিয়ে তুলে এনে না থাকে। নিয়ে এলে কি করবেন?'

'কি আর করব?' শুকনো গলায় বললেন ক্যাম্পবেল। 'তবে এত তাড়াতাড়ি গিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছে বলে মনে হয় না। অত সহজ না। কিন্তু সোনাগুলো তো ওর নয়, আনতে যাবে কোন অধিকারে?'

'সেকথাই যদি বলেন, তাহলে তো আপনারও নয়। যাই হোক, আপনার ধারণা, এখনও সময় আছে, প্লেন নিয়ে গেলে ওদের আগে পৌঁছানো যাবে, সেজন্যেই আমার কাছে এসেছেন।'

আবার অস্বস্তি দেখা দিল ক্যাম্পবেলের চোখে। 'বুঝতে তাহলে পেরেছেন।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল ওমর। 'কিন্তু আপনি যান বা যে-ই যাক, সোনাগুলোর মালিকানার ব্যাপারটা স্থির করে নিশ্চিত হয়ে যাওয়া ভাল। নইলে কষ্ট করে তুলে আনা হলো, আর অন্য কেউ এসে মালিকানার দাবিতে সেটা কেড়ে নিল, তাহলে আফসোসের

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

সীমা থাকবে না।'

'মালিক আইনত এখন সেই বীমা কোম্পানি, যারা বীমার টাকা শোধ করে দিয়েছে। তবে সোনার আশা নিশ্চয় ছেড়ে দিয়েছে ওরা। ওরা ধরেই নিয়েছে জাহাজটা এখন পানির তলায়।'

'কিন্তু যদি জানে ওপরেই আছে, আর সোনাগুলোও বহাল তবিয়তে রয়েছে—যদিও কুমেরুতে, তুলে আনার চান্স ফিফটি ফিফটি, তখন কি করবে বলা যায় না। যাকগে, এই সোনার কথা আর কাউকে বলেছেন?'

'কি করে বলব? আমি নিজেই তো জানতাম না। স্টারি ক্রাউন জাহাজটার কথাই জানতাম না আমি, এখানে এসে শুনলাম। তবে সীল শিকারের কথাটা রিপোর্ট করেছি আমি।'

'তাহলে প্রথম কাজই হবে জাহাজটার মালিকানা ঠিক করা, যাতে উদ্ধার করে আনার পর মাল নিয়ে টানাহেঁচড়া না পড়ে। বীমা কোম্পানিকে গিয়ে সব কথা খুলে বলতে হবে। যদি ওরা অভিযানের খরচ আর সেই সঙ্গে সোনার একটা ভাগ দিতে রাজি থাকে, তো ঝামেলা চুকে গেল। আর যদি বলে, না ভাই খরচ-টরচ দিতে পারব না, তোমরা পারলে তুলে নাওগে, তাহলে ওদের কাছ থেকে লিখিত নিতে হবে যে স্যালভেজ করা জাহাজ আর এর সমস্ত মালামাল আপনার; ওরা আর কিছু দাবী করতে আসবে না। আমার ধারণা, "সেক্ষেত্রে যা পেলাম তাই লাভ" ভেবে নামমাত্র মূল্যে জাহাজের মালিকানা ছেড়ে দেবে।'

'তা নাহয় দিল,' খুশি হতে পারলেন না ক্যাম্পবেল, 'কিন্তু ওই নামমাত্র মূল্য দেয়ার পরও আমার গাঁট খালি হয়ে যাবে। এই অভিযানের খরচ অনেক, আমি একা কুলাতে পারব না। জাহাজে করে গেলে হয়তো কিছুটা কম হবে, কিন্তু তাতে অনেক সময়

লাগবে আর দেরি হয়ে যাবে। গিয়ে হয়তো দেখব আমার আগেই পোত্রাঘাই গিয়ে সব সাফ করে নিয়ে এসেছে। তখন আমও গেল, ছালাও, পথের ফকির হব।'

'পোত্রাঘাই কিসে যাবে বলে মনে হয় আপনার? জাহাজে করে?'

'সে তো বটেই। তবে অন্য আরেকটা জাহাজ জোগাড় করতে হবে তাকে। বেত্রাঘাইকে নিয়ে যেতে পারবে বলে মনে হয় না। ওটার কিছু নেই আর।'

'আমার তা মনে হয় না,' মাথা নাড়ল ওমর। 'জাহাজের অনেক দাম। ওর মত লোক হুট করে আরেকটা ভাল জাহাজ কেনার মত এত টাকা জোগাড় করতে পারবে না।'

'তাহলে ভাড়া নেবে।'

'তা-ও পারবে না।'

'কেন?'

'ভাড়া নিতে গেলেই কোথায় যাবে, কেন যাবে, এ সব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে তাকে। কি জবাব দেবে? সত্যি কথাটা কি বলতে পারবে? বললেই তখন ঘাড়ে চাপবে। জাহাজের মালিক মুখ যদি বন্ধও রাখে, শুধু ভাড়াতে যেতে রাজি হবে না, সোনার ভাগ চাইবে। পোত্রাঘাইয়ের লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাবে তখন, এ প্রস্তাবে রাজি হতে পারবে না। অপরিচিত জাহাজ আর নাবিক নিয়ে যাওয়ার চেয়ে পুরানো জাহাজে করে পুরানো লোকদের নিয়ে যেতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে সে।' পোড়া সিগারেটের গোড়াটা অ্যাশট্রেতে গুঁজল ওমর। 'আমার কথা শেষ।'

লম্বা দম নিলেন ক্যাম্পবেল, 'এখন তাহলে কি করব?'

'আমার সঙ্গে কি জন্যে দেখা করতে এসেছিলেন আপনি?'

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

'ভেবেছিলাম আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।'

'কিভাবে?'

'প্লেন নিয়ে আমার সঙ্গে যাবেন সেখানে। সোনাটা ভাগাভাগি করে নিতে পারি আমরা। প্রস্তাবটা কি অযৌক্তিক?'

'অযৌক্তিক নয়, যদি আমি যেতে চাই। কিন্তু মিস্টার ক্যাম্পবেল, সোনার লোভ আমার এক বিন্দুও নেই। সোনার চেয়ে নিজের জীবনটাকে অনেক বেশি মূল্যবান মনে করি আমি। জীবনটা যে ভাবে চলছে এখন, তাতে মোটেও অখুশি নই আমি। শুধু শুধু আত্মহত্যা করতে যাব কেন, বলুন?'

'এতটাই কঠিন আর অসম্ভব মনে হচ্ছে আপনার কাছে?' অবাক হলেন ক্যাম্পবেল। 'আমি তো জানতাম প্লেন নিয়ে দুনিয়ার যে কোন জায়গায় চলে যাওয়া যায়।'

'অনেকেই তাই ভাবে। যাওয়া যায় না তা বলি না, তবে এরও একটা সীমা আছে। কুমেরু থেকে ঘুরে আসার পরেও আমি বলব আপনি জায়গাটা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন না। পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্গমতম জায়গায় যাওয়া নিয়ে আলোচনা করছি আমরা। আধুনিক যন্ত্রপাতি সহ খুব ভাল একটা জাহাজ নিয়ে যাওয়াটাও খুব কঠিন। আর যন্ত্রপাতি ছাড়া প্লেন নিয়ে যাওয়াটা তো রীতিমত বিপজ্জনক। যেতে হলে অন্তত দুটো প্লেন লাগবে, তা-ও বড় আকারের। তার খরচ জানেন?'

মেঝের দিকে চোখ চলে গেল ক্যাম্পবেলের। 'আমি অবশ্য এতটা সমস্যা হবে ভাবিনি।'

'হয়তো যতটা বলছি ততটা সমস্যা হবে না। কিন্তু এমনভাবে আটঘাট বেঁধে যাওয়া উচিত, যাতে বেঁচে ফেরার আশা থাকে, সুযোগও থাকে। অহেতুক ঝুঁকি নিয়ে লাভটা কি? আমি যেমন

জানি, হয়তো আপনিও জানেন কয়েকটা দেশের সরকারের নজর এখন কুমেরুর দিকে। সুমেরুর চেয়ে কুমেরুর প্রতি তাদের আকর্ষণ বেশি। এর কারণ হলো কম দূরত্ব, সুমেরুর চেয়ে কুমেরুতে যেতে সময় লাগে কম। তা ছাড়া কুমেরু এক বিশাল জায়গা, ষাট লক্ষ বর্গমাইল। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ওই জমাট বরফের নিচে মাটি আছেই আছে, নইলে বরফ আটকে থাকতে পারত না। আর সেই মাটির নিচে রয়েছে সোনা, কয়লা, তেল থেকে শুরু করে সব ধরনের ধাতুর বিশাল বিশাল খনি। যে দেশ এর মালিক হবে, সেটা লালে লাল হয়ে যাবে যদি সে-সব সম্পদ তুলে আনতে পারে। সেজন্যে চেষ্টাও চালানো হচ্ছে ঘন ঘন। আমেরিকান সরকারও চেষ্টা করছে। শেষ যে অভিযানটা চালানো হয়েছিল, তাতে প্লেন ব্যবহার করা হয়েছিল, সেগুলোতে যে আধুনিক যন্ত্রপাতি কি পরিমাণ ছিল তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তারপরেও কি ভোগান্তিটাই না গেছে বিজ্ঞানীদের। এর জন্যে বেশি দায়ী হলো কুমেরু সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা।'

প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে ওমরের দিকে তাকিয়ে আছে সব ক'টা মুখ। যেন ছেলেবেলার রূপকথার গল্প শুনছে।

আরেকটা সিগারেট ধরাল ওমর। 'প্রথম সমস্যাটাই হলো সীমারেখা নিয়ে। কোনখান থেকে মূল ভূখণ্ড শুরু হয়েছে, পানির সীমানা কোনটা, সেটাই সঠিকভাবে জানা যায়নি এখনও। কারণ পানি জমাট বেঁধে বরফ হয়ে থাকে। কখনও ভেঙে ভেঙে সরে যায়, কখনও আরও বেশি যুক্ত হয়। তাতে কোন সময়ই উপকূলভাগের চেহারা একরকম থাকে না। ওপর থেকে মনে হয় জমাট বাঁধা মসৃণ বরফ, নামতে গেলে বাধে বিপদ। কারণ

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

যেটাকে মসৃণ মনে করা হয়েছিল সেটা প্রায় ফুটখানেক পুরু মিহি বরফের গুঁড়োতে ঢাকা, পা ফেললেই ডেবে যায়, আর প্লেনের চাকার যে কি দুর্গতি হবে, অনুমান করা কঠিন নয়–এমনকি আপনার পক্ষেও নয়, কারণ আপনি গেছেন জলপথে, জাহাজে করে। কখনও বৃষ্টি হয় না ওখানে, নিশ্চয় জানেন, তবে তুষারপাত হয়, সেই সঙ্গে চলে বাতাসের ঘূর্ণি, সেই তাণ্ডবের মধ্যে প্লেন থেকে বরফের ওপরটা দেখা যাবে না। নামার পরে ওঠার কথাটাও মাথায় রাখতে হবে।'

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকালেন ক্যাম্পবেল। 'সত্যি, অদ্ভুত এক জায়গা। দিন ভাল থাকলে চতুর্দিকে একশো থেকে দেড়শো মাইল পর্যন্ত নজর চলে, কারণ বাতাসে আর্দ্রতা একেবারে নেই। ঠিক একই কারণে আকাশের রঙ দেখা যায় বেগনি-লাল, নীল নয়; আর আর্দ্রতা না থাকার কারণে রোদ এতটাই প্রখর হয়ে ওঠে, তাপমাত্রা শূন্যের নিচে থাকার পরেও চামড়া পুড়িয়ে দেয়। আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেলে, আর তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটলে তো কথাই নেই, যোলোকলা পূর্ণ হবে। সাদা হয়ে যাবে সবকিছু। ব্ল্যাক-আউটের কথা শুনেছেন, তাতে সব কালো, অন্ধকার হয়ে যায়, কুমেরুতে হয়ে যায় হোয়াইট-আউট। যেদিকে তাকানো যায়, সব সাদা, সাদার জন্যে কোন কিছুই চোখে পড়ে না। সব দিক থেকে আলো আসছে, তাই ছায়াও পড়ে না। প্লেন নিয়ে নামতে গেলে বরফে গিয়ে ধাক্কা খাওয়ার আগে বুঝতেই পারবেন না যে নিচে নেমেছেন। সামনে সব সাদা বলে দশ হাজার ফুট উঁচু বরফের পাহাড়ও হয়তো চোখে পড়বে না আপনার। যখন গুঁতো লাগবে, তখন আর জেনেও লাভ নেই; চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে প্লেন।'

'প্লেন নিয়ে ওখানে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার নেই,' ওমর

বলল, 'কিন্তু যারা গেছে তাদের লেখা পড়ে মনে হয়েছে, ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিল তারা, আর সেই দুঃস্বপ্নটা বাস্তব দুঃস্বপ্ন। শেষ আবহাওয়া কেন্দ্রটা রয়েছে ওদিকে কারগুয়েলেন আইল্যান্ডে, সেটাও কুমেরু থেকে বহুদূরে; ওখানেই যে পরিমাণ আইসবার্গ রয়েছে আর কুয়াশা পড়ে, শুনলে যাওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে দেবে যে কোন বুদ্ধিমান লোক। তবে আরেকটা আবহাওয়া কেন্দ্র আর গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে কুমেরু থেকে ছয়শো মাইল দূরে-গাউ আইল্যান্ডে। ওখানে প্লেন নামানো যায়। আর বেশি কিছু বলতে চাই না, অনেক বলে ফেলেছি; কুমেরু সম্পর্কে আপনাকে এত কথা শোনাতে যাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না, আপনি ওখান থেকে ঘুরেই এসেছেন, তবু আলোচনার খাতিরে এতসব বলা। সবশেষে শুধু একটা কথাই বলতে চাই, সবচেয়ে আশাবাদী পাইলটটিও ওখানে গিয়ে স্টারি ক্রাউনকে খুঁজে বের করে, সোনাগুলো তুলে নিয়ে নিরাপদে ফেরার আশা করবে না। ওখানে আটকা পড়ার কথা ভাবতেই গায়ের রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে আমার।'

'আমারও,' মুসা বলল।

'আপনার কথা বুঝতে পারছি,' নিরাশ কণ্ঠে বললেন ক্যাম্পবেল।

'সময়, প্রচুর টাকা আর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকলে সোনাগুলো তুলে আনার চেষ্টা করে দেখা যেত,' ওমর বলল, 'কিন্তু অত টাকা আপনার যেমন নেই, আমারও নেই। আর থাকলেও নিজের খরচে সেটা করতে যেতে রাজি হতাম না আমি।' এক মুহূর্ত ভাবল সে। 'বীমা কোম্পানি খরচ দিতে রাজি না হলেও অবশ্য উপায় আরেকটা আছে। যে কোন দেশের

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com

সরকারেরই সোনা প্রয়োজন, আমাদের সরকারেরও তাই। জায়গামত গিয়ে ধরাধরি করতে পারলে অভিযানের খরচটা হয়তো জোগাড় করা যায়, কিন্তু সেক্ষেত্রে সোনাগুলো চেয়ে বসবে ওরা। এনে দেয়ার জন্যে আমাদেরকে একটা পার্সেন্টেজ দিতেও রাজি হবে, এই দশ, পনেরো, ওরকম কিছু। আর ব্যর্থ হলে খরচের সমস্ত টাকাটাই যাবে ওদের, আমাদের কোন লোকসান নেই। তবে, জীবনটা খোয়ানোর ঝুঁকি থাকবে। সেটা অবশ্য নিজেদের পকেটের টাকা খরচ করলেও থাকবে। আপনি রাজি থাকলে সরকারী খরচে যাওয়া যায় কিনা চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'আমি রাজি,' বলতে সামান্যতম দ্বিধা করলেন না ক্যাম্পবেল।

'তাহলে আজ থেকেই চেষ্টাটা শুরু করে দেব।'

'ঠিক আছে,' উঠে দাঁড়ালেন ক্যাম্পবেল, 'সে-ভার আপনার ওপরই ছেড়ে দিলাম।'

ওমরও উঠে দাঁড়াল, 'ঠিকানা রেখে যান, যাতে যোগাযোগ করতে পারি। যদি যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি, আপনাদের দুজনকেও যেতে হবে। আপনি যাবেন গাইড হিসেবে, স্কুনারটা কোথায় আছে দেখিয়ে দেবেন। আপনার ছেলে যাবে মেকানিক, রেডিও অপারেটর আর পাইলট হিসেবে।' রোজারের দিকে তাকাল সে, 'কি, কোন আপত্তি আছে তোমার?'

'না, স্যার, কোন আপত্তি নেই,' জোরে জোরে মাথা নাড়ল রোজার ক্যাম্পবেল, 'ওই সাইকেলের দোকান থেকে বেরোতে পারলে এখন আমি বাঁচি।'

দুজনকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল ওমর।

'শীতের জামাকাপড়গুলো বের করব নাকি গিয়ে আলমারি

থেকে?' খানিকটা রসিকতার সুরেই জিজ্ঞেস করল মুসা।

সঙ্গে সঙ্গে ধরল রবিন, 'কেন, তোমার তো মেরু অঞ্চলে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না।'

'সবাই চলে গেলে আমি একা একা রকি বীচে বসে মাছি মারব নাকি? সবে মিলে করি কাজ, মরি বাঁচি নাহি লাজ...'

'এখানে লাজ শরমের তো কোন ব্যাপার নেই, আছে ভয়; মরতে ভয় পাও কিনা সেটা বলতে হবে।'

'বেশ,' কবিতাটা শুধরে দিল মুসা, 'সবে মিলে করি কাজ, মরি বাঁচি নাহি ভয়...'

হেসে উঠল রবিন, 'মিলল তো না।'

'বুঝলাম,' কপালে ভাঁজ ফেলে দিয়ে কানাই মাস্টারি ভঙ্গিতে বলল মুসা, 'আধুনিক কবিতা সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই। আধুনিক কবিতায় কোনো কিছু মেলানো লাগে না। আমারটা তো তা-ও বোঝা যায়, বেশির ভাগ কবিতার তো কি যে বলতে চায় মাথামুণ্ড কিছুই বুঝি না...'

হেসে ভুরু নাচাল ওমর। 'কাজ পেয়ে গেছি, ফালতু তর্ক করে নষ্ট করার সময় নেই। যাওয়ার জন্যে তৈরি হতে হবে আমাদের। মুসা, তুমি যে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করছিলে, তার জবাবে বলি, কুমেরুতে যেতে হলে শুধু শীতের জামাকাপড়ে চলবে না, ডীপ ফ্রিজে ঢুকে বসে থাকা যায় যাতে, তেমন পোশাক লাগবে।'

anmsumon@yahoo.com www.murchona.com ©

তিন

পনেরো দিন পর মেরু সাগরের ধূসর জলরাশির ওপর দিয়ে দুটো বিমানকে দক্ষিণে উড়ে যেতে দেখা গেল। বহু পুরানো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ওয়েলিংটন বম্বার, এককালে ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর গর্ব ছিল এগুলো, এখন মিউজিয়ামের জিনিস। একটার ককপিটে বসা ওমর, পাশে কিশোর। পেছনে রেডিও কম্পার্টমেন্টে রবিন আপাতত রেডিওম্যানের দায়িত্ব পালন করছে। আর সঙ্গে রয়েছেন ক্যাপ্টেন ক্যাম্পবেল। অন্যটায় রয়েছে রোজার আর মুসা। পথে গাউ আইল্যান্ডে নেমে যাবে ওরা। ওমররা সোজা এগিয়ে যাবে কুমেরুর দিকে।

পনেরো দিন খুব ব্যস্ততায় কেটেছে ওদের সবারই। টাকা জোগাড় করার পর একটা দিন নষ্ট করেনি, বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু তারপরেও দুশ্চিন্তা যাচ্ছে না ওমরের। পোত্রাঘাই আগেই চলে গেছে কিনা কে জানে, তাহলে সব পণ্ড হবে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, পোত্রাঘাই যাবেই, ওর মত লোক এত সোনার লোভ সংবরণ করতে পারবে না। দুটো দলের দেখা হয়ে গেলে যে সংঘর্ষ বাধবেই, তাতে কোনই সন্দেহ নেই, সেজন্যে তৈরি হয়েই যাচ্ছে ওমর। তবে ওদের আগে গিয়ে কাজটা সেরে চলে আসতে পারলে ঝামেলাটা এড়ানো যেত।

স্টারি ক্রাউনের বীমার টাকা শোধ করেছিল যে কোম্পানিটা, সেই কোম্পানিটার অস্তিত্বই নেই আর, লোকসান দিয়ে দিয়ে ফতুর হয়ে বহুকাল আগেই উঠে গেছে। অভিযানের জন্যে টাকা আদায় করতে অনেক তর্কবিতর্ক, ঝগড়াঝাটি করতে হয়েছে ওমরকে সরকারের বিশেষ বিশেষ দপ্তরের লোকের সঙ্গে। রাজি আর কোনমতেই হতে চায় না ওরা। অবশেষে নিমরাজি হলো, বলল, সমস্ত সোনা এনে ওদের দিয়ে দিতে হবে। ওমর বলল, 'বাহ্, চমৎকার কথা! প্রাণ বাজি রেখে যাব, এত কষ্ট করে সোনা উদ্ধার করে আনব, তারপর সব দিয়ে দেব আপনাদের। ছাগল পেয়েছেন নাকি আমাদের? কমপক্ষে পনেরো পার্সেন্ট কমিশন দিতে হবে। অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় কেবল এত কমে করতে চাইছি। রাজি হলে হোন, নইলে যেখানে আছে সেখানেই থাকুক পড়ে ওই সোনা। অন্য কাউকে জানিয়ে দেব, ওরা গিয়ে তুলে নিয়ে আসবে। তথ্যটা জানানোর জন্যে হয়তো নগদ কিছু টাকাও ধরে দিতে পারে।' খানিকক্ষণ ঘ্যানর ঘ্যানর করে শেষে ট্রেজারির কর্মকর্তা বললেন, 'ঠিক আছে, যান, দেব দশ পার্সেন্ট।' খরচের টাকা নিয়েও চাপাচাপি। শেষমেষ যা দিতে রাজি হলো ওরা, তাতে সারপ্লাস আর্মি স্টোর থেকে দুটো পুরানো ওয়েলিংটন ছাড়া আর কোন বিমান পাওয়া গেল না। কি আর করবে। ওদুটোকেই সারিয়ে-সুরিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত করে নিয়েছে। আধুনিক বিমানের চেয়ে গতি অনেক কম হলেও নির্ভর করা যায় বিমান দুটোর ওপর।

এগুলোকে কুমেরুতে নিয়ে যাওয়ার উপযোগী করে তুলতে কম পরিশ্রম করতে হয়নি তিন গোয়েন্দা, ওমর আর রোজারকে। প্রথমেই অস্ত্রশস্ত্র আর লড়াইয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় যে সব যন্ত্রপাতি

aminsumon@yahoo.com
www.murchona.com

বসানো ছিল, প্রায় সব খুলে নিতে হয়েছে। ওজন কমানোর জন্যে। তার জায়গায় বসানো হয়েছে বড় বড় তেলের ট্যাংক–যেটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস; কারণ বহু দূরের পথ পাড়ি দিতে হবে ওদের, আবার ফিরেও আসতে হবে। মাঝপথে তেল শেষ হয়ে গেলে মরা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাঁবু, রসদপত্র নেয়া হয়েছে বিমান ভর্তি করে। যদি সোনা পাওয়া যায়, কিছু কিছু কম প্রয়োজনীয় জিনিস ফেলে দিয়ে তার জায়গায় সোনা ভরা হবে। বরফের ওপর ফুটখানেক পুরু হয়ে জমে থাকা তুষারে চাকা নামাতে অসুবিধে হবে, বিমান উল্টে যাওয়ার ভয় আছে, তাই স্কি ফিট করে নিয়েছে এমনভাবে যাতে তার নিচে চাকার ২ য়েক ইঞ্চি বেরিয়ে থাকে। এতে চাকাও কাজ করবে, একই সঙ্গে স্কি-ও কাজ করবে। এই পদ্ধতি ওদের নিজের আবিষ্কার নয়, বহু বছর আগে বিমানে করে কুমেরু অভিযানে বেরিয়েছিলেন একদল বিজ্ঞানী, তাঁরা এ ভাবে চাকা আর স্কি একসঙ্গে ব্যবহার করে সফল হয়েছিলেন। দুটো বিমান নেয়ার কারণ, একটা যাবে কুমেরুতে, আরেকটা থেকে যাবে হেডকোয়ার্টারে। কোন কারণে কুমেরুতে যাওয়া বিমানটা দুর্ঘটনায় পড়ে গেলে রেডিওতে জানাবে দ্বিতীয় বিমানটাকে–যদি জানানোর অবস্থা থাকে ওদের, সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করতে ছুটবে দ্বিতীয়টা। ওসব জায়গায় সচরাচর কেউ যায় না, বিপদে পড়লে উদ্ধার করার মত অন্য কোন জাহাজ বা বিমানকে পাওয়া যাবে কিনা বলা কঠিন, তাই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে যাতে না থাকতে হয় সেজন্যে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে এসেছে ওরা।

হেডকোয়ার্টার করা হয়েছে সাউ আইল্যান্ডকে। একটা বিমান নিয়ে ওখানে থাকবে মুসা আর রোজার। সর্বক্ষণ রেডিওর সামনে।

যোগাযোগ রক্ষা করবে। ডাক পেলেই সঙ্গে সঙ্গে বিমান নিয়ে উড়ে যাবে কুমেরুর উদ্দেশে।

দিনটা সুন্দর। দৃষ্টিও চলে চমৎকার। কিন্তু ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতেই স্নায়ুর ওপর অদ্ভুত চাপ টের পেল কিশোর। যখনই ভাবতে গেল ওদের জীবন এখন সম্পূর্ণ নির্ভর করছে বিমানটার ইঞ্জিনের ওপর, অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। যদি কোন কারণে এখন বিগড়ায় ওটা, পানিতে পড়ে যায়, কয়েক মিনিটের বেশি বাঁচবে না ওরা, সাগরের পানি এখানে ভয়াবহ ঠাণ্ডা, মুহূর্তে জমে যাবে শরীর। মানসিক চাপ বাড়তেই থাকল। কাটানোর জন্যে সামনে-পেছনে, আশেপাশের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করল। কি দেখবে? কিছুই নেই দেখার। সব একই রকম, সব একঘেয়ে। হাঁটুতে বিছানো ম্যাপের দিকে তাকাল। জাহাজ চলাচলের পথ ফেলে এসেছে বহু পেছনে। ঢোক গিলল সে। ইঞ্জিনের শব্দকে মনে হলো অন্য রকম। যেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ঢোক গেলা বন্ধ করে দিল।

ডানে বহুদূরে কুখ্যাত গুড হোপ এখন অস্পষ্ট ছায়ার মত, আমেরিকা মহাদেশের সর্বদক্ষিণ প্রান্তটা মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। আবার ম্যাপের দিকে তাকাল সে। সামনে হাজার মাইলের মধ্যে যেসব দ্বীপ রয়েছে রোমাঞ্চকর সব নাম সেগুলোর–মাউন্ট মিজারি, ডেসোলেশন আইল্যান্ড, লাস্ট হোপ বে, ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট ফিউরিজ। মনে মনে বাংলা করল নামগুলোর–দুর্দশার পর্বত, নিরানন্দ দ্বীপ, শেষ আশার উপসাগর, পূর্ব ও পশ্চিমের ক্রোধ। নামগুলো দিয়েছিল প্রাচীন নাবিকেরা, জায়গাগুলোর চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে। অবাক হয়ে ভাবল, আরও দক্ষিণের মহাদেশটার কি নাম দিত ওরা, যদি সেখানে যেতে পারত? যেতে পারেনি, তাই দিতেও

amimsumon@yahoo.com www.murchona.com

পারেনি। কুমেরু নামটার মধ্যে কোন ভয়াবহতা নেই। এটা অনেক পরে দেয়া হয়েছে। এখনও এখানে পারতপক্ষে আসতে চায় না কেউ, মাঝেসাঝে দু'একটা অতি দুঃসাহসী তিমি শিকারীর জাহাজ ছাড়া। পোত্রাঘাইয়ের কথা ভাবল। মনে পড়তেই জাহাজের খোঁজে চারপাশে তাকাতে লাগল। কোন ধরনের একটা জলযানও চোখে পড়ল না। সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা বড় বড় আইসবার্গগুলো যেন সদাজাগ্রত ভূতুড়ে প্রহরীর মত পৃথিবীর শেষ সীমানাটাকে পাহারা দিয়ে চলেছে সেই কোন্ অনাদিকাল থেকে।

ওমরের দিকে তাকাল সে। ওর ভাবলেশহীন চেহারা দেখে মনে কি চলেছে কিছু অনুমান করা গেল না। থেকে থেকে চোখ দুটো শুধু চঞ্চল হয়ে উঠছে, নিচের ধূসর সাগরের দিকে তাকাচ্ছে, ফিরে আসছে আবার ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে। মাঝে মাঝে নোট লিখছে এক টুকরো কাগজে। গোমড়া শূন্যতার মাঝে একঘেয়ে গুঞ্জন করে চলেছে বিমানের ইঞ্জিন।

গাউ আইল্যান্ড এসে গেল। চক্কর দিয়ে নেমে যেতে শুরু করল মুসাদের বিমান। দ্বীপের একপাশে আমেরিকান নেভির ছোট-বড় কয়েকটা জাহাজ দেখা গেল। নিশ্চয় মহড়া দিতে এসেছে। ডেক থেকে দূরবীন দিয়ে বিমান দুটোকে দেখছে ওরা। রেডিওতে জানতে চাইল, 'কোথায় যাচ্ছো?' রবিন জানাল, গবেষণার কাজে কুমেরুতে যাচ্ছে।

ওমররা এগিয়ে চলল। গাউ আইল্যান্ড পার হয়ে আসার পর থেকে সাগরে ভাসমান বরফের টুকরোর সংখ্যা বাড়তে থাকল। অদ্ভুত চেহারার বার্গ আর ছোট আকারের গ্রাউলারগুলো পার হয়ে যাচ্ছে নিচে। যতই দক্ষিণে এগোচ্ছে, বাড়ছে ওগুলোর সংখ্যা।

বিচিত্র তাদের রঙ। সাদা, হালকা সবুজ, নীল তো আছেই, কোন কোনটা বাতির মত জ্বলজ্বলে, কোনটার গায়ে আবার কালো কালো দাগ দেখে মনে হয় মাটির গা থেকে উপড়ে তুলে আনা হয়েছে। আকৃতিও বিচিত্র। কোনটা স্তম্ভের মত, কোনটা বা দুর্গ, আবার কোন কোনটা এত বড় আর সমতল, বিমান নামানোর রানওয়ের মত। একটা তো এত বড়, পার হতে পুরো বিশ মিনিট লেগে গেল। এগুলোর কাছে নিজেদেরকে বড়ই নগণ্য আর ক্ষুদ্র মনে হতে লাগল কিশোরের। প্রকৃতির বিশালত্বের কাছে এমনই লাগে মানুষের। প্লেনে করে সাহারা মরুভূমি পাড়ি দেবার সময়ও এই অনুভূতি হয়েছিল ওর।

এ সব দেখেটেখে ওমর ভাবছে, কাজটা নেয়া বোধহয় ভুলই হয়ে গেছে। কুমেরু সম্পর্কে শুধু বই পড়া আর ভিডিও দেখা জ্ঞান তার। বাস্তব অবস্থা দেখে দমে গেল। তা-ও তো কুমেরুতে পৌঁছায়নি এখনও। এতদূর এগিয়ে আর ফিরে যাওয়াও সম্ভব না। ট্রেজারিকে কি জবাব দেবে? সাগর কোনখানে শেষ, কোথা থেকে ভূখণ্ড শুরু হয়েছে বোঝার কোন উপায় নেই। সামনে শুধুই বরফ আর বরফ। বরফের সমভূমি, বরফের টিলা, বরফের পাহাড়। এতক্ষণ ওগুলোর মাঝে বেশ পানি চোখে পড়ছিল, বড় পুকুর কিংবা লেকের মত, এখন সেটাও কমে এসেছে। একপাশের সাগরকে বাদ দিলে সামনে ডোবার সমান জায়গায় পানি চোখে পড়ছে কদাচিত। সীমাহীন বরফের নিচে যে কি আছে, পানি না মাটি, তা-ও বোঝার উপায় নেই। ঠাণ্ডাও বেড়েছে। কেবিনের হীটারও কুলিয়ে উঠতে পারছে না। জানালার কাঁচ ঘোলা হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে মনে করেছিল বাইরে কুয়াশা পড়ছে, কিন্তু পরে সন্দেহ হওয়ায় অ্যালকোহলে ন্যেকড়া ভিজিয়ে কাঁচের ভেতরটা

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

মোছার পর যখন পরিষ্কার হয়ে গেল, বুঝল কুয়াশা নয়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার জন্যে হচ্ছে এ রকম।

অবশেষে কথা বলল সে, 'গ্রাহাম ল্যান্ডের কিনারে চলে এসেছি আমরা। মাটির তো কোন চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি না। তবে ম্যাপ আর হিসেব-নিকেশ তাই বলছে। বেজ-এ যোগাযোগ করতে বলো রবিনকে। মুসাকে আমাদের অবস্থান জানাতে বলো। আর ক্যাপ্টেন ক্যাম্পবেলকে ডাকো। কথা আছে।'

উঠে চলে গেল কিশোর। খানিক পর ফিরে এসে জানাল মুসাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তার পেছনে এসে দাঁড়ালেন ক্যাম্পবেল।

'সামনেটা দেখুন তো, ক্যাপ্টেন,' ওমর বলল। 'দেখুন কিছু চিনতে পারেন নাকি। উঁচু একটা জায়গা, আইসবার্গের মত দেখা যাচ্ছে। নিচে পাহাড়ও থাকতে পারে। যদি তাই হয়, এটাকে চিহ্ন ধরে রাখতে হবে।' এক টুকরো কাগজ বাড়িয়ে দিল। 'এই যে আমাদের পজিশন। আমার ধারণা আপনারা জাহাজটা দেখেছিলেন এখান থেকে একশো মাইল দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিমে। সেদিকেই যাব এখন। কিছুটা পুব ঘেঁষে এগিয়েছি অ্যাডমিরালটি ইনফরমেশনের ওপর ভিত্তি করে, ওরা বলছে বরফের ভেসে যাওয়ার প্রবণতা উত্তর-পুব দিকে। হিসেব মত এদিকেই সরে আসার কথা জাহাজটার। তাহলে চোখে পড়ে যাবে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন ক্যাম্পবেল। অনেকক্ষণ দেখে নিয়ে বললেন, 'কিছুই তো চিনতে পারছি না। পারার কথাও নয় অবশ্য। বরফ তো আর এক জায়গায় স্থির থাকে না, বরফের চেহারাও বদলাতে থাকে।'

'ওপর থেকে তাহলে জাহাজটা দেখার উপায় কি?'

'কোনই উপায় নেই। আমরা দেখে যাওয়ার পর তুষারপাত হয়েছে। জাহাজের ওপরের অংশটা আগের চেয়ে পুরু বরফে ঢেকে গেছে নিশ্চয়। নিচে বরফের ওপর দাঁড়িয়ে দেখলে একটা পাশ হয়তো চোখে পড়বে, মাস্তুল আর কেবিনটাও দেখা যেতে পারে, তবে সবই বরফে ঢাকা।'

'খানিকটা নিচে নামাই, কি বলেন? তবে পাঁচশো ফুটের বেশি নামানো যাবে না। বার্গগুলো অনেক উঁচু। সামনে থেকে দূরত্বটা বোঝাও যাচ্ছে না পরিষ্কার। বাড়ি লাগলে শেষ। আমি চালাই, আপনি দেখুন জাহাজের মত কিছু চোখে পড়ে কিনা।'

'ঠিক আছে।'

কিশোর কিছু বলল না। এই বিশালত্বের মাঝে অর্ধেক ডুবে থাকা একটা জাহাজকে খুঁজে বের করা কয়েক হাজার খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার চেয়েও কঠিন মনে হচ্ছে তার কাছে। আগে ভাবেইনি তুষারপাত হয়েও যে ঢেকে যেতে পারে জাহাজটা, এখানকার সব কিছুর মত ওটাও সাদা হয়ে মিশে যেতে পারে। সহজে নিরাশ হয় না সে। কিন্তু এ মুহূর্তে, ওমর যখন উত্তরে নাক ঘোরাল বিমানের, কোন রকম আশা করতে পারল না কিশোর।

তবে ওমরেরও ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। গতি কমিয়ে উড়ে চলল। গ্রাহাম ল্যান্ড একটা উপদ্বীপ। আধঘন্টা পর জানাল উপদ্বীপটার পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছে গেছে। প্রান্তটা লম্বা একটা বাহুর মত ঠেলে বেরিয়ে আছে সাগরের দিকে। সাগরের পানি খুব কম জায়গাতেই চোখে পড়ছে। এবড়ো-খেবড়ো বরফের দেয়াল তৈরি হয়েছে বাহুটার ওপর, কোথাও মাত্র দশ ফুট উঁচু, কোথাও অনেক বেশি—একশো ফুট। তার ওপাশে শুধুই সাদা, দিগন্ত বিস্তৃত বরফের সমভূমি যেন। চাপ লেগে মালভূমি আর টিলার মত উঁচু

anmsuman@yahoo.com
www.murchona.com

হয়ে ঠেলে উঠেছে জায়গায় জায়গায়। পানির সীমারেখা বোঝা যায় এখানে, কিন্তু সেটাই উপকূলের সীমা কিনা নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। কারণ বরফ জমছে আর ভাঙছে, জমছে আর ভাঙছে; মূল ভূখণ্ড থেকে সাগরের ভেতরে কতটা ছড়িয়ে আছে আলগা বরফ বোঝা যাচ্ছে না। তবে বরফ ভেঙে গেলে জাহাজের পক্ষে সবচেয়ে কত বেশি এগোনো সম্ভব সেটা অনুমান করা যায়। তাতে অনুমান করা গেল, স্টারি ক্রাউনের ধ্বংসাবশেষ এই সীমারেখা থেকে বড়জোর দু'মাইল ভেতরে থাকবে, তার বেশি না।

আরেকটু নিচে নেমে চক্কর মারতে শুরু করল ওমর। উপকূল ধরে চক্কর দিতে দিতে এগিয়ে চলল। কিন্তু জাহাজের মত কোন কিছুই নজরে পড়ল না।

বড় বড় কতগুলো জানোয়ারের দিকে আঙুল তুলল কিশোর।

ক্যাম্পবেল বললেন ওগুলো ওয়েডেল সীল। এত দক্ষিণে ওরা ছাড়া আর কোন স্তন্যপায়ী জীবের বাস নেই। পাখির মধ্যে বড় আকারের রুকারি আর পেঙ্গুইন আছে।

নতুন এক আতঙ্ক এসে হাজির হলো হঠাৎ। ঈগলের মত ঠোঁট আর কালো বাঁকা নখওয়ালা বড় বড় হলুদ রঙের কতগুলো পাখি ঘিরে ফেলল বিমানটাকে। ধাক্কা লাগে লাগে। ক্যাম্পবেল জানালেন, ওগুলো স্কুয়া। প্রায় মিনিট দুই বিমান ঘিরে উড়ে চলল ওরা, তারপর সরে গেল।

কিশোরের দিকে তাকাল ওমর, 'অনেক তো দেখলাম, কি করা যায় বলো তো?'

'সত্যি আমার পরামর্শ চাইছেন?' অবাক হলো কিশোর। 'এ জায়গা সম্পর্কে আমি কি জানি...'

'হ্যাঁ, চাইছি। ওপর থেকে এর বেশি দেখা যাবে না। শুধু শুধু

তেল নষ্ট করব। জাহাজটা যদি এখনও পানির ওপর থেকে থাকে, তো বিশ মাইলের মধ্যেই আছে। নতুন করে তুষার পড়ে ঢেকে গেছে বলেই দেখতে পাচ্ছি না। নিচে নেমে গ্রাউন্ড লেভেল থেকে দেখলে হয়তো চোখে পড়বে। কিন্তু একলা আমার ইচ্ছেয় নিচে নামার ঝুঁকি আমি নিতে চাই না। যার যার জীবন তার তার, দায়িত্বটাও সে-ই নেবে। সবাই মিলে বললে তবেই নামব। নিচে নামব, না ফিরে যাব?'

দ্বিধা করছে কিশোর। নামা বা খালি হাতে ফিরে যাওয়া কোনটাই মনঃপূত হচ্ছে না তার। 'নিচেই নামব। ওপর থেকে দেখা না গেলে নিচে নেমেই দেখতে হবে।'

'আমিও নিচে নামার পক্ষে।'

কিশোরের দিকে তাকাল ওমর, 'রবিনকে জিজ্ঞেস করে এসো।'

'আমাদের কথাই বলবে সে।'

'তা-ও জিজ্ঞেস করে এসো। পরে যেন কিছু বলতে না পারে।'

যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এল কিশোর। 'নামতে বলেছে।'

'যান, পেছনে গিয়ে সীট বেল্ট বেঁধে নিন,' ক্যাপ্টেনকে বলল ওমর।

সামনের সমতল অঞ্চলটার দিকে উড়ে গেল সে। জায়গার কোন অভাব নেই, কিন্তু তুষার কতখানি পুরু বোঝা যাচ্ছে না।

তাকিয়ে আছে কিশোর। নামার আগে শেষবারের মত চক্কর দিয়ে আসছে ওমর। বাতাস নেই। হালকা সবুজ বরফের রঙ। দেখে মনে হচ্ছে কঠিন, সমতল, চাকা নামাতে কোন অসুবিধেই নেই। কিন্তু নামালেই বসে যাবে কোন সন্দেহ নেই।

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

নিচে নামল ওমর। চাকা নামাতেই স্কি-ও নেমে এল। দম আটকে রেখেছে কিশোর। কিন্তু কোন অঘটন ঘটল না। আবার বেড়ে গেল ইঞ্জিনের গতি। ওপর দিকে উঠে গেল বিমানের নাক।

হেসে উঠল ওমর। তবে তার মধ্যে আনন্দ নেই। কিশোরের মতই টানটান হয়ে আছে তারও স্নায়ু, বুঝতে অসুবিধে হয় না। 'ঘটনাটা কি বুঝতে পেরেছ? বরফ ছোঁয়নি চাকা। যেখানে নামাতে চেয়েছি তার আরও অন্তত দশ ফুট নিচে রয়েছে বরফ। তুষারে ঢাকা জায়গায় প্লেন নামানো এমনিতেই কঠিন, কিন্তু এখানে যা আলো-নানা রকম খেলা খেলতে থাকবে, কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই।'

তবে পরের বারে আর ভুল করল না ওমর। ঠিকই নামিয়ে ফেলল চাকা। তীক্ষ্ণ হিসহিস শব্দ তুলে পিছলে যেতে লাগল স্কি। মিহি তুষারের গুঁড়ো লাফ দিয়ে উঠল ওপরে, ধুলোর মত উড়তে লাগল। উইন্ডস্ক্রীন ঢেকে দিয়ে আটকে দিল দৃষ্টিশক্তি। তবে দ্রুতই নেমে গেল আবার। বিমানের গতিও দ্রুত কমল, চাকা শক্ত বরফে চাপ দিতে পারছে না বলে গড়াতে পারল না। দাঁড়িয়ে গেল বিমান।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। বিরাট স্বস্তির। বুঝতে পারছে স্কি না লাগালে কি সাংঘাতিক ভুলটাই না হয়ে যেত। এতক্ষণে নাকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকত বিমানটা।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল ওমর। হালকা স্বরে জানতে চাইল, 'পৃথিবীর তলায় নেমে অনুভূতিটা কেমন হচ্ছে?'

'ভীষণ ঠাণ্ডা!'

'বাইরে আরও বেশি ঠাণ্ডা। চলো, বেরোই। কতটা বেশি, দেখা যাক।'

চার

শূন্যের নিচে সতেরো ডিগ্রি তাপমাত্রা। কুমেরুর উপযোগী পোশাক পরে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই একটা তাঁবু খাড়া করে ফেলল ওরা। চারপাশ ঘিরে দিল বরফের নিচু দেয়াল তুলে। তাঁবুর নিচের ফাঁকগুলো বন্ধ করে দিল তুষার ঠেসে দিয়ে। বিমান থেকে সমস্ত জিনিসপত্র নামিয়ে এনে ভরল সেই তাঁবুতে। হাত-পা ছড়ানোর জন্যে খুব অল্পই জায়গা রইল। মাঝখানে রাখা হলো একটা ফোল্ডিং টেবিল। চারপাশ ঘিরে বাক্সগুলো এমন করে সাজাল যাতে চেয়ারের কাজ দেয়। স্লীপিং ব্যাগ আর কম্বলগুলো ফেলে রাখা হলো একধারে, সময়মত খোলা যাবে। ওমর বলল, বাইরে থেকে এখানে ঠাণ্ডা কিছুটা কম।

তাড়াহুড়ো করে মাল নামানোর একটা বড় কারণ, বিমানের বোঝা কমাতে চাইছিল ওমর, যাতে ভারের চোটে তুষারে দেবে না যায় ওটা। পানির কাছ থেকে দু'শো গজ দূরে ল্যান্ড করেছে সে। তুষার এখানে যথেষ্ট গভীর, তবে অন্যান্য জায়গায় আরও বেশি গভীর। এই কমবেশির জন্যে বাতাস দায়ী। চিনির দানার মত তুষারকণা ঢেউ তৈরি করে বিছিয়ে আছে, মরুভূমির বালির ঢেউয়ের মত।

একটা বড় সুবিধে পাচ্ছে ওরা এখন, অন্ধকার হয়ে যাওয়ার

anisumon@yahoo.com
www.murchona.com©

ভয় নেই। বছরের এ সময়টায় সূর্য ডোবে না, সারাক্ষণ দিগন্তরেখার ওপরে একই জায়গায় বসে থাকে, সুতরাং চব্বিশ ঘন্টাই দিনের আলো পাওয়া যায়। যখন রাতের অন্ধকার নামার কথা, তখনও অদ্ভুত এক আলোর আভায় আলোকিত হয়ে থাকে বিচিত্র এই বরফের রাজ্য, লাল রঙের মস্ত একটা বলের মত যেন দূরের বরফের ওপর বসে থাকে সূর্যটা। ভঙ্গি দেখে মনে হয় ধাক্কা দিলেই গড়াতে শুরু করবে।

বিমান থেকে দৃশ্যটা আরও চমৎকার লাগে। ক্রমশ উঠে যাওয়া ঢালের শেষ মাথায় বরফের পাহাড়। দূর থেকে ঘাসে ঢাকা মাটির পাহাড়কে যেমন দেখা যায় ঠিক তেমনি লাগে দেখতে, ফ্যাকাসে নীল। ওগুলোর মাঝে মাঝে বরফের চাঙড় বাড়িঘর আর দুর্গের রূপ নিয়ে এমন করে বসে আছে, মনে হয় যেন লোকালয় রয়েছে ওখানটায়, গেলেই মানুষের দেখা পাওয়া যাবে। দিগন্তে বসা সূর্য সব কিছুকে রাঙিয়ে রাখে শেষ বিকেলের লালিমার মত।

জিনিসপত্র সব গোছগাছ হয়ে গেলে স্টোভ জ্বেলে খাবার তৈরি করতে বসল ওরা। সহজ রান্না। খাওয়ার শুরুটা হবে টিনের স্যুপ গরম করে নিয়ে, শেষ কড়া লিকার আর অতিরিক্ত চিনি মেশানো চা দিয়ে। ঠাণ্ডা দূরে রাখতে এর জুড়ি নেই, ওমর বলল। তার সঙ্গে একমত হলেন ক্যাম্পবেল।

জ্যাম লাগানো রুটি চিবোতে চিবোতে ক্যাম্পবেলকে জিজ্ঞেস করল ওমর, 'জাহাজটা খুঁজে পাওয়ার উপায়টা কি?'

'একটা উপায়ই দেখতে পাচ্ছি, পানি বাদ দিয়ে অন্য সব দিকে হাঁটা। পানির দিকে যাওয়ার কোন দরকার নেই। ওদিকে থাকবে না। বরফের আওতা থেকে সরে গিয়ে পানিতে পড়লে মুহূর্তে তলিয়ে যাবে। চাপে চাপে তলাটা ভর্তা হয়ে গেছে নিশ্চয়।

ক্যাম্পটাকে কেন্দ্র ধরে হাঁটা শুরু করব আমরা। দুই-এক মাইল গিয়ে ঘুরে আধমাইলমত পাশে সরে ফিরে আসব। সমস্ত জায়গা দেখা হয়ে যাবে। সবাই একসঙ্গে যাব না। ছড়িয়ে পড়ে খুঁজব। তাতে সময় লাগবে কম। দু'একদিনের মধ্যেই সবটা দেখা হয়ে যাবে। যদি না পাই, তাহলে ক্যাম্প সরাতে হবে। অন্য জায়গায় গিয়ে খুঁজব। কাজটা ভীষণ কঠিন। কিন্তু এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

'কঠিন আর কই,' রবিন বলল, 'আমার কাছে তো সহজই মনে হচ্ছে।'

'হাঁটা শুরু করো না একবার, তারপর বুঝবে কঠিন না সহজ,' ক্যাম্পবেল বললেন। 'আবহাওয়ার ব্যাপারটাও গোলমেলে। কোন ঠিকঠিকানা নেই। এই ভাল তো এই খারাপ। সামান্য একটু বাড়লেই কিংবা দু'এক ডিগ্রি এদিক ওদিকে হলেই যা খুশি ঘটে যেতে পারে। তুষার পড়া শুরু হলে...'

'আগে পড়ুক তো,' বাধা দিল ওমর। 'আগেই এত কিছু শুনে ফেললে শেষে বেরোতেই ভয় লাগবে। হাঁটা ছাড়া আমিও আর কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না। প্রশ্ন হলো, ঠিক জায়গায় নেমেছি তো?'

'আমার তো কোন সন্দেহ নেই। দু'এক মাইলের মধ্যেই আছে জাহাজটা। যেদিন রওনা হয়েছিলাম, দিনটা পরিষ্কার ছিল। যন্ত্রপাতিও ঠিক ছিল। তিন তিনবার পরীক্ষা করেছি আমি। তিনবারই করি সব সময়, যাতে ভুল হতে না পারে। বরফ সরে গিয়ে জাহাজটাকে সরিয়ে নিতে পারে অবশ্য।'

তাঁর কথাকে সমর্থন জানাতেই যেন দূরে, সাগরের দিকে শোনা গেল ভারী গুমগুম শব্দ, তারপর অদ্ভুত চাপা গর্জন। যেন

দুটো দৈত্য মল্লযুদ্ধ শুরু করেছে।

'শুনলেন তো? বরফের সঙ্গে বরফের ঘষার শব্দ। দুটো আইসবার্গ সরে এসে ধাক্কা দিচ্ছে একে অন্যকে। এর মধ্যে কোন জাহাজ পড়লে কি ঘটবে বুঝতেই পারছেন।'

'বরফ সরে বটে,' কিশোর বলল, 'কিন্তু সেটাকে অত গুরুত্ব দেয়ার কিছু আছে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানীদের মতে দিনে কয়েক ফুটের বেশি না। মূল বরফখণ্ডটার কথা বলছি আমি, যেটার ওপর রয়েছি আমরা এখন। ভেঙে যাওয়া ছোট ছোট খণ্ডগুলো অবশ্য অনেক দ্রুত সরে, তাতে কোন সন্দেহ নেই; পেছন থেকে বাতাসে ঠেলতে থাকলে তো কথাই নেই। জাহাজটা মূল বরফখণ্ডে আটকে থাকলে আপনি যেখানে দেখে গিয়েছিলেন তার থেকে বেশি দূরে সরেনি।'

আবার শোনা গেল বরফের গর্জন।

'দেরি না করে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়া দরকার,' ওমর বলল। 'ক্যাম্প খালি করে সবাই চলে না গিয়ে একজনকে অন্তত থাকতে হবে এখানে, পাহারা দেয়ার জন্যে। ফিরে এসে যদি দেখি সমস্ত জিনিসপত্র তছনছ করে ফেলেছে সীলমাছে, দুঃখের সীমা থাকবে না। সিগন্যালার হিসেবেও কাজ করবে সে।'

'সিগন্যালার মানে?' বুঝতে পারল না রবিন।

'কুয়াশা আর তুষারপাতের ঝুঁকি সব সময়ই রয়েছে এখানে। দিনের আলো থেকেও তখন লাভ হয় না, কিছু দেখা যায় না। তাঁবুতে ফেরা কঠিন হয়ে যাবে। এ রকম কিছু ঘটলে ক্যাম্প থেকে গুলির শব্দ করে জানান দিতে হবে। তাঁবুতে ফেরা যাবে তখন। একে অন্যের কাছ থেকে বেশি সরা ঠিক হবে না, কয়েকশো গজের মধ্যে থাকতে হবে, পরস্পরের দৃষ্টিসীমার মধ্যে।

তাহলে প্রয়োজনে হাত নেড়ে ইশারা করেও কিছু বোঝানো যাবে।'

'ঠিক আছে, তাই করা হবে,' ক্যাম্পবেলও অমত করলেন না। 'নিরাপত্তার দিকটাই প্রথম দেখা উচিত। কোন কিছু খোঁজার জন্যে হাঁটা শুরু করলে অনেক ক্ষেত্রেই হুঁশ থাকে না। যখন খেয়াল হয়, দেখা যায়, পথ হারিয়ে বসে আছে। জাহাজ থেকে আধমাইল দূরে গিয়েও হারিয়ে যেতে শুনেছি সীল শিকারীদের। একটা ঘটনা তো আমার চোখের সামনেই ঘটেছে এখানে। তার নাম ছিল জেনসেন। ভাল নাবিক ছিল। সীল শিকারে ওস্তাদ। ফেলে আসা একটা সীলমাছের চামড়া আনতে পাঠিয়েছিল তাকে পোত্রাঘাই। বরফ ঘিরে আসতে শুরু করেছে তখন। তাড়াতাড়ি জাহাজ সরিয়ে আনা ছাড়া উপায় ছিল না। পরে বুঝেছি, ইচ্ছে করেই ওই সময় পাঠিয়েছিল ওকে পোত্রাঘাই, দেখতে পারত না বলে। তাকে রেখেই চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। আর দেখা যায়নি জেনসেনকে।'

'কেউ শুনলে ভাববে আমরা যা করতে এসেছি এটা কোন কাজই না,' কিশোর বলল। 'প্লেন আছে, কোথায় আসতে হবে জানা আছে, কি করতে হবে জানি; কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে কাজটা সেরে ফিরে যাওয়া মোটেও সহজ হবে না। ঘাপলা একটা বাধবেই।'

'সেই ভয়টা আমার আগে থেকেই আছে,' ওমর বলল। 'আমার জানা মতে আজ পর্যন্ত কোন স্যালভেজ অপারেশন নির্বিবাদে শেষ হয়নি, কোন না কোন গণ্ডগোল হয়েছেই। কখন যে কি অঘটন ঘটে যাবে কেউ বলতে পারে না। আমাদের বেলায় এবারে কি ঘটবে কে জানে। ভালয় ভালয় শেষ হলেই বাঁচি। একটা কথা ভেবে শান্তি পাচ্ছি, মেরিন এয়ারক্রাফট নিয়ে

ammsumon@yahoo.com www.murchona.com

আসিনি। সাগরের কথা ভাবলে তো ফ্লাইং-বোট আনারই কথা ছিল। পানিতে নামতে সুবিধে, ডাঙার কাছে নামিয়ে ফেললেই হলো. প্রথমে অবশ্য তাই মনে করেছিলাম। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, বরফের দেশ, কখন জমে যাবে কোন ঠিকঠিকানা নেই। এখন দেখছি, ভাল করেছি। যখন নামছিলাম, পানি কতটা খেয়াল করেছ? যুদ্ধজাহাজ ঢোকানো যেত। আর এখন দেখো।'

তাকাল কিশোর। ভাসমান বরফের চাঁই গিজগিজ করছে পানিতে, শুরুতে যেমন পরিষ্কার ছিল পানি তেমন আর নেই। চাঁইগুলোর কোন কোনটা এতবড়, ছোটখাট একেকটা দ্বীপের সমান। 'কি সাংঘাতিক! ফ্লাইং-বোট নিয়ে এলে ভাল বিপদে পড়তাম। ওড়ানোর জন্যে দৌড় দেয়ার তো জায়গা নেই।'

'আস্ত থাকলে তো ওড়াতে। ওসব বরফের সামান্যতম ছোঁয়া লাগলেই চিরে ফালাফালা হয়ে যাবে প্লেনের পেট, চাপে পড়লে ভর্তা।...কিন্তু কথা অনেক হলো। বেরোনো দরকার। তাঁবু পাহারায় থাকবে কে?'

'রবিনই থাক,' কিশোর বলল। 'আপত্তি আছে?'

'না। আমার পালা তো আসবেই। তখন যাব।'

হাসল কিশোর। 'কেন, প্রথমবারেই যদি পেয়ে যাই?'

'পেলে তো ভাগ্য খুবই ভাল। তারপরেও যাওয়ার সুযোগ থাকবে আমার। যাও।'

'বসে না থেকে রাতের রান্নাটা সেরে ফেলো। তুষার গলিয়ে পানিও বের করা লাগবে খাওয়ার জন্যে।'

'সবই করব। নিশ্চিন্তে চলে যাও।'

'ক্যাপ্টেন,' ওমর বলল, 'আপনি বাঁয়ে যান, পানির ধার ঘেঁষে। কিছু দেখলে চিৎকার করে ডাকবেন আমাকে। আপনার পরেই

আমি থাকব।'

'ঠিক আছে।'

'কিশোর, তুমি ডানে ঘুরে যাও। বেশি সরতে যেয়ো না। কিছু দেখলে তুমিও ডাকবে আমাকে। আমি কিছু দেখলে, আমিও ডাকব। তিনজনের সঙ্গেই তিনজনের যোগাযোগ রাখতে পারব এভাবে।'

'হ্যাঁ, ভাল বুদ্ধি।'

'চলো, বেরোই।'

দেখতে অতটা খারাপ মনে না হলেও বাস্তবে যে কতটা কঠিন, ক্যাম্পবেলের এ কথার প্রমাণ পেতে দেরি হলো না কিশোরের। যতটা ভেবেছিল, অবস্থা তারচেয়ে অনেক খারাপ। তবে এর একটা ভাল দিকও আছে, পরিশ্রম বেশি হলে গা গরম থাকে। হাঁটতে গিয়ে আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করল, তুষারের গুঁড়োতে গভীর পায়ের ছাপ রেখে যাচ্ছে, দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে সেটা; এ চিহ্ন ধরে তাঁবুতে ফিরে যেতে সুবিধে হবে।

কোথাও গোড়ালি ডোবে, কোথাও কোমর সমান তুষার, কোথাও বা একেবারেই নেই। এটা দেখে উপলব্ধি হলো, কি একটা অসাধ্য সাধন করতে এসেছে। এ রকম বরফের মধ্যে তুষারে ঢাকা একটা জাহাজের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব মনে হতে লাগল তার কাছে। উঁচু হয়ে থাকা টিলাটক্করগুলোর যে কোনটার নিচে ঢাকা পড়ে থাকতে পারে ওটা, বোঝার কোনই উপায় নেই। তবু নিরাশ হলো না সে। আশা ছেড়ে দিলে কোন কাজই সম্ভব হয় না।

বাঁয়ে, সিকি মাইল দূরে দেখা যাচ্ছে ওমরকে; সাদা কার্পেটে কালো গুবরেপোকার মত। হঠাৎ আর দেখা গেল না। বোধহয়

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

কোন টিলার আড়ালে চলে গেছে। কয়েক মিনিট পরও যখন দেখা গেল না ওকে, কিছু করবে কিনা ভাবতে লাগল কিশোর। কিন্তু নিজের জায়গা ছেড়ে, খোঁজা বাদ দিয়ে অন্য কিছু করতে যাওয়াটাও ঠিক মনে হলো না। পেছনে তাকাতে নতুন অস্বস্তিতে পড়তে হলো যখন দেখল তার ফেলে আসা পায়ের চিহ্নগুলো মুছে যাচ্ছে। তুষার যে দ্রুত নড়ে, অন্তত ওপরিভাগটা, তার প্রমাণ দেখতে পেল। সমস্যা আরও আছে। ওপরের দু'এক ইঞ্চি তুষার ক্রমাগত বাতাসে উড়তে থাকে, তাতে এক ধরনের ঝিলিমিলি তৈরি হয়, স্পষ্ট দেখাও যায় না ওপরটা। তবে ঝিলিমিলি নিয়ে মাথা ঘামাল না বিশেষ। আলো এখনও চমৎকার। দেখা যায় সবকিছু। মুখের কাছে হাত জড় করে ওমরের উদ্দেশে একটা চিৎকার ছুঁড়ে দিল সে। তাকিয়ে রইল দেখার জন্যে বরফের স্তূপ বা টিলার ওপাশ থেকে বেরিয়ে আসে কিনা ওমর।

এল না। ধীরে ধীরে একটা সন্দেহ মাথাচাড়া দিতে শুরু করল মনে। ফিরে তাকাল সূর্যের দিকে। নেই ওটা। ধূসর দিগন্ত। কিছু একটা ঘটছে। কি, বুঝতে পারল না। সব কিছু ঠিকমত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তো? নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না এখন। চিৎকার করে ডাকল ওমরকে। কান পেতে রইল জবাবের আশায়। পেল না। পেছনে ফিরে হাঁটতে শুরু করল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।

অনুমান করল, তাঁবু থেকে মাইল দুয়েক দূরে এসেছে। এক ঘন্টার বেশি লেগেছে আসতে। কোনদিকে যেতে হবে জানে। তারপরেও অস্বস্তিবোধটা যাচ্ছে না। ফিরে তাকিয়ে যখন দেখল তার পায়ের ছাপ মুহূর্তে মুছে দিচ্ছে উড়ন্ত ঘূর্ণায়মান তুষারকণা, অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল।

শীঘ্রিই বুঝতে পারল, দৃষ্টিগোচর হওয়ার ব্যাপারটা মোটেও স্বাভাবিক নয়। অথচ ও ভেবেছিল সব কিছুই বুঝি ঠিকঠাক আছে। গাধা মনে হলো নিজেকে। আধঘন্টা ধরে এক অদ্ভুত সাদা পৃথিবীর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গলদঘর্ম হলো, যে ব্যাপারটা সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন ক্যাম্পবেল, কিন্তু গুরুত্ব দেয়নি সে। দূরে গুলির শব্দ শুনল মনে হলো কয়েকবার, কিন্তু সত্যি গুলি, না বরফ ভাঙার শব্দ, নিশ্চিত হতে পারল না।

সামনে বরফ ভাঙার পরিচিত শব্দ হতে থমকে দাঁড়াল। বরফে বরফে ঘষা লাগার শব্দও হচ্ছে। তারমানে ভাসমান বরফ। আর ভাসমান মানে পানির কিনারে চলে এসেছে সে। তাহলে তাঁবুটা কাছাকাছিই কোথাও আছে। কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছে তার। এই বরফের রাজ্যে কোন কিছুকেই আর বিশ্বাস নেই। হেঁটে চলল ধীরে ধীরে। সামনে তিরিশ ফুট উঁচু একটা বরফের ধোঁয়াটে দেয়াল চোখে পড়ল। তার ওপাশে সাগর।

দাঁড়িয়ে গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবার চেষ্টা করল। সামনে পানি। তারমানে তাঁবুটা দূরে নয়। কিন্তু কোনদিকে? ডানে, না বাঁয়ে? চিৎকার করে রবিনের নাম ধরে ডাকল। সাড়া নেই। আবার ডাকল। আবার। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে। সবচেয়ে অবাক হচ্ছে, গুলি করে জানান দিচ্ছে না কেন রবিন? আবহাওয়া এ রকম করে বদলে গেলে, সবকিছু পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর না হলে তো তার গুলি করার কথা। কোন দিকে যাবে ঠিক করতে পারছে না। ভুল করলে ক্যাম্প থেকে দূরে সরে যাবে। ফেরা তখন আরও কঠিন হয়ে উঠবে।

ভেবেচিন্তে একটা বুদ্ধি বের করল। বরফের দেয়ালটা ধরে

animsumon@yahoo.com
www.murchona.com

হেঁটে যাবে পনেরো মিনিট। এর মধ্যে তাঁবুটা খুঁজে না পেলে উল্টোদিকে ঘুরে হাঁটা শুরু করবে। আবার পনেরো মিনিট হাঁটলে যেখানে রয়েছে সেখানে ফিরে আসবে। তাতে এখনকার চেয়ে অবস্থা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা আর থাকবে না।

মনস্থির করে নিয়ে ঘড়িতে সময় দেখে হাঁটতে শুরু করল সে। টানটান হয়ে উঠেছে স্নায়ু। হঠাৎ কুয়াশার ভেতর থেকে বিশাল ধূসর একটা ছায়া অদ্ভুত ভঙ্গিতে নেচে নেচে এগিয়ে আসতে শুরু করল তার দিকে। আরও কাছে আসার পর চিনতে পারল, ওয়েডেল সীল। আকাশ থেকে দেখে এতটা বড় প্রাণী মনে হয়নি এগুলোকে। তাকে দেখে থমকে গেল সীলটা। আগে বোধহয় কখনও মানুষ দেখেনি। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বিচিত্র ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ করতে করতে সরে যেতে লাগল। কিশোরের কাছ থেকে কয়েক গজ দূরে গিয়ে বরফের মাঝখানে গোল একটা ডোবার মধ্যে ডাইভ দিয়ে পড়ে হারিয়ে গেল।

সাদা পৃথিবীটা যেভাবে অজান্তেই তৈরি হয়েছিল, তেমনি করেই দূর হয়ে গেল আবার। দৃষ্টিগোচর হতে লাগল আবার সবকিছু। কথার শব্দ কানে এল। সে চিৎকার করে ডাকতে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া এল। শব্দ লক্ষ করে এগিয়ে যেতে চোখে পড়ল পরিচিত তাঁবুটা। রবিনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে ওমর আর ক্যাম্পবেল।

'কোনদিক চলে গিয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করল ওমর।

'চলে যাইনি,' কিশোর বলল, 'হারিয়ে গিয়েছিলাম।'

'কোথায়?'

'কুয়াশার মধ্যে।'

'কিসের কুয়াশা?'

অবাক হলো কিশোর, 'কিসের কুয়াশা মানে? জানেন না?'

'না।'

'কুয়াশা দেখেননি, সত্যি?'

'হালকা একটুখানি ছিল একজায়গায়, তবে এত সামান্য পাত্তাই দিইনি। হঠাৎ গায়েব হয়ে গেলে তুমি। সেটাকেও গুরুত্ব দিইনি। ভাবলাম টিলা বা চাঙড়ের আড়ালে চলে গেছ। হাত নেড়ে ক্যাম্পবেলকে ইশারা করে ক্যাম্পে ফিরে এলাম।'

'আমি ঢুকে পড়েছিলাম ঘন কুয়াশার মধ্যে। এত ঘন, কোন কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।'

'অবাক কাণ্ড!'

'তুমি যেখানে ঢুকেছিলে,' ক্যাম্পবেল বললেন, 'সেখানে বাতাস বোধহয় অন্যরকম ছিল। এখানে বাতাসের গতিবিধির ওপর নির্ভর করে কুয়াশা, সামান্য একটু তারতম্য হলেই ঘন কুয়াশা পড়তে শুরু করে।'

'বাতাসেই করুক আর যেটাতেই করুক, শেষ দিকে তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম।' রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'গুলির শব্দ শোনার অপেক্ষায় ছিলাম আমি।'

'প্রয়োজন মনে করিনি,' জবাব দিল রবিন। 'আমার এখানে তো কুয়াশা ছিল না। ওমরভাই আর মিস্টার ক্যাম্পবেলকেও আসতে দেখতে পাচ্ছিলাম। ভাবিইনি তুমি বিপদে পড়েছ।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর, 'আমি নিজেও জানতাম না। অনেক পরে বুঝেছি।'

'জাহাজের মত কিছু চোখে পড়েছে?' জিজ্ঞেস করল ওমর।

'নাহ্। আপনার?'

মাথা নাড়ল ওমর। 'না, আমারও পড়েনি। শুধুই বরফ আর

arnmsumon@yahoo.com www.murchona.com©

বরফ। ক্যাপ্টেনও কিছু দেখেননি।'

'জাহাজটাকে এবার খুঁজে পেলে ভবিষ্যতে কোন কাজকেই আর অসম্ভব ভাবব না।'

'দেখা যাক কাল চেষ্টা করে, তোমার ভবিষ্যতের সব কিছুকেই সম্ভব করে দেয়া যায় কিনা,' হাসল ওমর। 'এখন এসো, কিছু খেয়ে নেয়া যাক।'

পাঁচ

পরের তিনটে দিন ব্যর্থ খোঁজা খুঁজে বেড়াল ওরা। কেউ মুখ ফুটে কিছু বলছে না, কিন্তু জানে আরেকজন কি ভাবছে। কোন আশা নেই।

রোজ দু'তিনবার করে গিয়ে বিমানের ইঞ্জিনটা স্টার্ট দিয়ে গরম করে ওমর। তুষার এখন পর্যন্ত ক্ষতি করতে পারেনি ওটার। লুব্রিকেশন সিসটেমটা নিয়েই বেশি ভয় তার। তবে এখনও ঠিকই আছে। বাকি তিনজনের জন্যে কুমেরুর দিনগুলো বড়ই দীর্ঘ আর একঘেয়েমিতে ভরা। কিছু ঘটছে না। আবহাওয়ার পরিবর্তন নেই। খোলা পানির দিক থেকে ভেসে আসে কেবল বরফ ভাঙার শব্দ আর ঘষা লাগার বিচিত্র গর্জন।

একটা ব্যাপারে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতেই হয়, সব কিছুই দৃশ্যমান রয়েছে। চলাফেরা করতে গিয়ে পথ হারানোর তেমন ভয়

নেই। প্রথম দিন কিশোরের বেলায় যে সমস্যাটা হয়েছিল, সেরকম যাতে আর কারও না ঘটে তার একটা সহজ সমাধান বের করেছে সে। প্যাকিং কেসের কাঠ ভেঙে লম্বা লম্বা ফালি করেছে। বেরোনোর সময় কিছু কিছু করে সঙ্গে নেয় সবাই। চলার পথে কিছুদূর পর পর একটা করে কাঠ পুঁতে রেখে এগোয়। পরে সেগুলো দেখে ফিরে আসাটা সহজ। এতে আরও একটা সুবিধে। কেউ যদি বিপদে পড়ে, সময়মত না ফেরে, অন্যেরা চিহ্ন দেখে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে আনতে পারবে।

আশেপাশের বেশির ভাগ জায়গাই দেখা হয়ে গেছে, খুব সামান্যই বাকি আছে আর। সেটুকু দেখা হয়ে গেলে কয়েক মাইল পুবে তাঁবু সরিয়ে নেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছে ওরা।

দূরে বসে ব্যর্থতার খবর পেয়ে পেয়ে মুসা আর রোজারও এখন হতাশ। সবচেয়ে বেশি হতাশ ক্যাপ্টেন ক্যাম্পবেল। নিজের পর্যবেক্ষণের ওপর আস্থা হারিয়েছেন তিনি। ভাবছেন, লগবুকে অবস্থান টুকে রাখার সময় ভুল করেননি তো? ভুল জায়গায় নামেননি তো? তবে ওমর হতাশ হয়নি। হতাশ হয়নি কিশোরও। এ সব কাজে ধৈর্য রাখতে হয়। সবচেয়ে বড় কথা, এখনও সুস্থ রয়েছে ওরা। ঠাণ্ডা ওদের কিছু করতে পারেনি। ক্লান্ত হয়ে পড়েনি ওরা। বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভাল লাগছে। কুমেরুকে এভাবে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়ে ভাগ্যবান ভাবছে নিজেদের।

চারদিনের দিন সকালে শেষবারের মত খুঁজতে বেরোল ওরা। এদিন কিশোর, রবিন আর ক্যাম্পবেল বেরোলেন; তাঁবু পাহারা দিতে আর রান্না করতে রয়ে গেল ওমর। ক্যাম্পবেল গেলেন বাঁয়ে, কিশোর মাঝে আর রবিন ডানে।

সাগরতীরে বরফের পাহাড়ের কিনার ধরে এগিয়ে চলল

ammsumon@yahoo.com www.murchona.com

রবিন। একশো গজ পর পর একটা করে কাঠ পোঁতে বরফে। আঠারো ইঞ্চির মত বেরিয়ে থাকে মাথাটা। গতি খুব ধীর। এর কয়েকটা কারণ। পানি আর বরফের সীমারেখা ধরে হাঁটতে হচ্ছে তাকে। কেমন একটা অসমাপ্ত জিগ্-স পাজ্লের মত হয়ে আছে জায়গাটা। এতে সরাসরি সমান জায়গা দিয়ে গেলে যতটা হাঁটতে হত, তারচেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি হাঁটতে হচ্ছে। পানির কিনারে বলে বরফ মোটেও সমতল নয়। পানির দিকের চাপেই হোক, কিংবা নিচের চাপেই হোক, করোগেটেড টিনের মত ঢেউখেলানো হয়ে গেছে বরফ। ঢেউগুলো কোথাও এত উঁচু, ওপাশে কি আছে চোখে পড়ে না। আকাশের রঙ ধূসর। অনেক ওপরে মেঘের স্তর। এত ওপর থেকে কখনও বৃষ্টি নামে না।

ঢেউ পেরিয়ে আসতে গিয়ে পরিশ্রমে ঘামতে শুরু করল সে। পেছনে তাকিয়ে তাঁবুটা আর চোখে পড়ে না এখন, বরফের দেয়ালের জন্যে। না পড়ুক, ভাবনা নেই, কাঠের চিহ্ন তো রেখেই আসছে। জাহাজটা খুঁজে পেলেই হয়।

কোথায় আছে ওটা? এদিকে কি সত্যি আছে? জায়গা চিনতে ক্যাম্পবেল ভুল করেননি তো? শেষবার জাহাজটাকে যেখানে দেখা গেছে, তখন পানির সীমারেখা যেখানে ছিল, হিসেবমত তারচেয়ে পানির অনেক কাছে রয়েছে সে। জাহাজটা ছিল পানি থেকে মাইলখানেক ভেতরে, সে এখন রয়েছে একশো গজ ভেতরে। এখানে থাকার কথা নয় জাহাজটা। তবে এটা মাটিও নয় যে সাগরের সীমারেখা বহুকাল ধরে একই রকম থাকবে। বরফ ক্রমাগত ভাঙছে। ভাঙতে ভাঙতে যদি পানির সীমারেখা ভেতরের দিকে সরে যেতে থাকে তাহলে জাহাজটা চলে আসবে পানির কাছাকাছি।

সামনে বরফের স্তূপ আর ঢেউয়ের ছড়াছড়ি। ওগুলোর কাছাকাছি আসতে হাঁটুতে বাড়ি লাগল কি যেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আলোর কারসাজি আর ছায়ার জন্যে এখানে অনেক সময় একহাত সামনের জিনিসও চট করে চোখে পড়ে না। অন্ধকারে যেমন সামনে পড়ে থাকা জিনিস অদৃশ্য হয়ে থাকে, সাদা আলোর মধ্যেও থাকে। বিড়বিড় করে গাল দিয়ে হাঁটু ডলার জন্যে নিচু হলো সে। নজরে পড়ল জিনিসটা। কৌতূহল জাগাল। জিনিসটা বরফই, তবে আকৃতিটা অদ্ভুত, ক্রুশের মত। সবচেয়ে কাছের গির্জাটাও এখান থেকে হাজার মাইলের বেশি দূরে, এখানে বরফের ক্রুশ বানাতে আসবে কে?

ওটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। কি যেন মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না। হঠাৎ মনে পড়ল গল্পটা। স্টারি ক্রাউনের সঙ্গে সম্পর্কিত। একজন লোক তার সঙ্গীকে খুন করে বাইরে নিয়ে গিয়ে কবর দিয়েছিল। নিশ্চয় ক্রুশ গেঁথে দিয়েছিল কবরের ওপর।

বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে। কোমর থেকে বড় হান্টিং নাইফটা খুলে নিয়ে কোপ দিল ক্রুশের বরফে। কয়েক কোপেই ঝরিয়ে দিল ওপরের বরফ। বেরিয়ে পড়ল কাঠ। দুই মিনিটের মধ্যে জেনে গেল কার কবর ওটা। কাঠের মধ্যে ছুরি দিয়ে কেটে খোদাই করে লেখা হয়েছে :

জন ম্যানটন

নামটা পড়া যায় কোনমতে, তবে মৃত্যুর সাল-তারিখ কিছু বোঝা যায় না।

যেটুকু বুঝেছে, যথেষ্ট। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম মুছল সে। হাতটা কাঁপছে। ওর পায়ের নিচেই একশো বছরেরও বেশি পুরানো একটা লাশ রয়েছে, বরফের মধ্যে থাকায় অবিকৃত;

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

ভাবনাটাও অস্বস্তিকর। ওর মতই সোনার সন্ধানে এসেছিল লোকটা, আর কোনদিন ফিরে যেতে পারেনি, শেষ ঠাঁই হয়েছে এই সীমাহীন বরফের রাজ্যে।

গায়ে কাঁটা দিল ওর। চারপাশে তাকাল। মনে হলো আগের চেয়ে ঠাণ্ডা বেড়ে গেছে। সব কল্পনা! গা ঝাড়া দিয়ে যেন দূর করে দিতে চাইল ভয় ধরানো ভাবনাগুলো। আসল কথা ভাবতে চাইল। খুনটা হয়েছে জাহাজের কাছাকাছি। একা লাশটাকে বেশি দূর বয়ে নিতে পারেনি লাস্ট, কিংবা প্রয়োজনই মনে করেনি।

এর মানেটা কি?

কাছাকাছিই আছে জাহাজটা!

উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন। আবার চারপাশে তাকাতে শুরু করল। প্রথমে বরফের স্তূপই মনে হলো ওটাকে। তীক্ষ্ণ হলো ওর দৃষ্টি। ধীরে ধীরে রূপ নিতে শুরু করল আকৃতিটা। বরফে এমন করে ঢেকে রয়েছে, জাহাজের খোল আর ডেক বলে মনেই হয় না।

পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে যেন রবিন। অদ্ভুত এক অনুভূতি হচ্ছে বুকের মধ্যে। কল্পনাই করেনি জাহাজটাকে এভাবে পেয়ে যাবে সে। দুর্বল লাগছে হাঁটু দুটো। গা কাঁপছে। কি করবে এখন? ফিরে গিয়ে জানাবে সবাইকে? জাহাজটা পেয়েছে বললে, প্রথমেই জানতে চাইবে সবাই, সোনাগুলো আছে তো ভেতরে?

সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলো না। জাহাজটা যখন পেয়েছে, ভেতরে সোনাগুলো আছে কিনা সেটাও দেখে যাবে এখনই।

কাত হয়ে আছে জাহাজটা। বরফে ঢাকা ডেকে উঠতে গিয়ে কয়েকবার পা পিছলে পড়ল। পা ভাঙার ভয়ে শেষে ওভাবে ওঠার চেষ্টা বাদ দিল। কতটা পুরু হয়ে জমেছে বরফ বোঝার উপায়

নেই।

উঠবে কি করে?

খুঁজতে খুঁজতে অদ্ভুত একসারি সিঁড়ির ধাপ চোখে পড়ল তার। বরফ কেটে তৈরি করেছে, জাহাজে ওঠার জন্যে। সেটা বেয়ে সহজেই উঠে এল। সিঁড়ির মাথার শেষ ধাপটার কাছ থেকে কম্প্যানিয়ন ওয়ে চলে গেছে। তাতে মানুষ চলাচলের চিহ্ন। অবাক হলো না। সোনার খোঁজ পাওয়ার পর বহুবার এ জাহাজে মানুষ উঠেছে। মাসের পর মাস বসবাস করেছে।

কম্প্যানিয়ন ওয়ে ধরে এগোলে কিছুটা সামনে উঁচু হয়ে আছে বরফ, নিশ্চয় নিচে নামার পথের ঢাকনা-টাকনা হবে। কাছে এসে দেখল, তার ধারণাই ঠিক। ঢাকনাটা নেই এখন, তার জায়গায় গোল করে বরফ কেটে ফোকর করা হয়েছে, গুহার প্রবেশ মুখের মত। সেখান থেকে নেমে যাওয়া কাঠের সিঁড়িতে বরফ জমে আছে। মানুষের তৈরি এক অদ্ভুত গুহা, কল্পনাকে হার মানায়।

সাবধানে সিঁড়িতে পা রাখল সে। পিছলে পড়লে কোমর ভাঙবে। নিচে নামতে শুরু করল। চারপাশে তাকিয়ে মনে হচ্ছে ওর, জাহাজটা শুধু বরফেই তৈরি, কাঠ বা কোন রকম ধাতু নেই। আজব এক পরীরাজ্যের মত লাগছে ভেতরটা। আলো আসছে ওপর থেকে। বরফের ভারে ধসে পড়েছে ডেক, মস্ত এক গর্ত হয়ে আছে সেখানটায়; আলো আসছে সেই ফোকর দিয়ে। ভেতরে নানা রকম মূর্তি তৈরি করেছে বরফ, বিচিত্র সব আকৃতি। ছাত থেকে ঝুলছে বরফের ঝাড়বাতি, যদিও আলো নেই সেগুলোতে। হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে দেখতে কোথায় আছে ক্ষণিকের জন্যে ভুলে গেল সে।

একটা করিডর চোখে পড়ল। এগিয়ে গেল সেটা ধরে। পা

টিপে টিপে, যতটা সম্ভব নিঃশব্দে। একটা ঘরে এসে ঢুকল। নাবিকদের মেসরুম। থালা-বাসন, কাপ, চামচ পড়ে আছে টেবিলে, যেন সেদিনই রাখা হয়েছে। খাবারের টিন খোলা। একটা বিস্কুট আর এক টুকরো গরুর মাংস তুলে নিয়ে শুঁকে দেখল। তাজা। বরফের রাজ্যটা বিশাল এক রেফ্রিজারেটর। কোন কিছু নষ্ট হয় না এখানে, পচে না।

কয়েকটা কেবিনে ঢুঁ মেরে দেখল। সবগুলোর দরজা হাঁ করে খোলা। আগ্রহ জাগানোর মত কিছু দেখা গেল না ওগুলোতে। একটা ঘরে বাংকের ওপর কম্বল দলামোচড়া হয়ে পড়ে আছে, যেন এইমাত্র ওটার নিচ থেকে উঠে গেছে কোন মানুষ। শেষের একটা ঘর দেখা গেল, অন্য সব ঘরের চেয়ে বড়। বরফের ছড়াছড়ি এখানেও, কিন্তু দেয়ালের বরফের সঙ্গে পানি দেখে বোঝা যাচ্ছে গলেছে। বরফ গলে গরমে। গরমটা লাগল কি করে! আগুন জ্বাললেই কেবল হতে পারে এ রকম। কিন্তু এখানে আগুন জ্বালতে আসবে কে?

ঘরের মাঝখানে বড় একটা টেবিল। তাতে চোখ পড়তেই স্থির হয়ে গেল চোখ। কালো কালো কিছু জিনিস স্তূপ হয়ে আছে। আকারটা ইঁটের মত। সোনার বার! কিন্তু সোনা তো হয় হলুদ, কালো নয়।

টেবিলের কাছে এসে একটা ইঁট তুলে নিতে গেল। ভীষণ ভারী। বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি পড়তে শুরু করল যেন। ওরা জানা আছে আয়তনের তুলনায় এ রকম ভারী হয় কোন্ ধাতু। ছুরি বের করে আঁচড় কাটল জিনিসটার গায়ে। ওপরের কালো রঙ কেটে গিয়ে ঝলমল করে উঠল ভেতরের হলুদ রঙ। বরফের মধ্যে শ্যাওলা বা ছত্রাক জাতীয় কিছু পড়ে ওপরটা কালো করে দিয়েছে।

উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে সে।

সোনা!

পেয়ে গেছে সোনাগুলো!

মৃদু একটা শব্দ কানে এল। বরফের টুকরো ভেঙে পড়ার মত। গুরুত্ব দিল না। চারপাশে ছড়ানো বরফ, একআধটা টুকরো ভেঙে পড়ে শব্দ হতেই পারে। গুপ্তধন আবিষ্কারের আনন্দ আর নেশায় আশেপাশের কোন কিছুকেই পাত্তা দিতে চাইল না। দেখিয়ে সবাইকে চমকে দেয়ার জন্যে খানিকটা সোনা তাঁবুতে নিয়ে যেতে চাইল সে। আস্ত একটা বার নেয়া কঠিন কাজ। যেটা তুলতেই কষ্ট হয়, একা বয়ে নিতে জান বেরিয়ে যাবে। ছুরির উল্টোদিকের করাতের মত ধারটা দিয়ে কাটতে শুরু করল। খাঁটি সোনা নরম হয়। কাটতে অসুবিধে হচ্ছে না। ছুরিটা সহজেই বসে যাচ্ছে দেখে হাসি ফুটল মুখে।

হঠাৎ মুছে গেল হাসিটা। আবার কানে এল সেই শব্দ। এবার আর বরফ ভাঙার মত নয়। হাসির শব্দের মত। আতঙ্কের ঠাণ্ডা শিহরণ যেন খামচে ধরল তার পিঠ, মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে যেতে লাগল শিরশির করে। কুসংস্কার নেই তার। ভূত বিশ্বাস করে না। তবু পলকের জন্যে ভাবনাটা খেলে গেল মাথায়, 'ম্যানটনের প্রেতাত্মা না তো!'

চারপাশে তাকাল। কোন কিছু নড়তে দেখল না। অখণ্ড নীরবতা।

নিজেকে বোঝাল, ভুল শুনেছে। কিংবা বাইরে থেকে এসেছে। হাসির শব্দের মত হলেও ওটা হাসি নয়, উড়ে যাওয়ার সময় স্কুয়া ডেকে উঠেছে। কিন্তু বুঝতে চাইল না মন। ভাল করেই জানে, স্কুয়া ওরকম শব্দ করে না। হাসিটা মানুষের।

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

'ধুর! মুসার রোগে ধরেছে!' বলে নিজেকে ধমক দিয়ে আবার ছুরি চালাতে শুরু করল সে। দু'তিনটে পোঁচ দিতে না দিতেই চোখের কোণ দিয়ে একটা ছায়া সরে যেতে দেখল সাঁৎ করে। আবার মনকে বোঝানোর জন্যে নানা রকম যুক্তি, 'ফোকর দিয়ে মেঘের ছায়া পড়ল নাকি?' কিন্তু মেঘের ছায়া পড়বে কি করে? আকাশের রঙ ধূসর। সূর্য নেই। মেঘও এত ওপরে, ছায়াই পড়বে না, সরে যাওয়া তো পরের কথা।

আবার পিঠ খামচে ধরল ভয়ের বরফ-শীতল অদৃশ্য আঙুলগুলো। ভূতের ভয়ে কাবু হয়ে যাচ্ছে বলে নিজেকে আবার ধমক লাগাল। কিন্তু কাজ হলো না কোন। ভয়টা গেল না।

আবার বার কাটতে শুরু করল। মন দিতে পারল না কোনমতেই। বার বার চোখ দুটো চলে যেতে চায় ঘরের শেষপ্রান্তে, যেদিকে ছায়াটাকে সরে যেতে দেখেছে।

দৃষ্টিটা স্থির হয়ে গেল হঠাৎ। বরফের পাশ দিয়ে বেরিয়ে আছে যেন আধখানা মানুষের মুখ। তাতে একটামাত্র চোখ বসানো। মুখটা মড়ার মুখের মত সাদা। গভীর কোটরে বসে থেকে চোখটা আগুনের মত জ্বলছে তার দিকে তাকিয়ে।

ছয়

কতক্ষণ সম্মোহিতের মত চোখটার দিকে তাকিয়ে ছিল সে বলতে

পারবে না। আচমকা গলা চিরে বেরিয়ে এল চিৎকার। একটা মুহূর্ত আর দাঁড়াল না সেখানে। ঘুরে দিল দৌড়। পড়িমরি করে চলে এল সিঁড়ির কাছে। কিভাবে যে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল, তা-ও বলতে পারবে না। এ ভাবে দৌড়ে ওঠার যে ঝুঁকি রয়েছে, পা পিছলে পড়লে হাঁটু ভাঙতে হবে, মনেই রইল না। যাই হোক, নিরাপদেই বেরিয়ে এল ডেকে। আবারও পা ভাঙার ভয় না করে বরফের সিঁড়ি বেয়ে নেমে তাঁবুর দিকে ছুটল। ছুটতে ছুটতে বার বার পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখল, ভূতটা তাকে ধরতে আসছে কিনা।

তাঁবুটা চোখে পড়তে আবার স্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগল তার মন। ভূতের ভয় কেটে যেতে শুরু করল।

ক্যাম্পে ফিরে দেখল কিশোর আর ক্যাম্পবেল ফিরে এসেছেন। তাঁর অবস্থা দেখে অবাক হয়ে তাকাল সবাই। কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

হাঁপানোর জন্যে প্রথমে কিছু বলতেই পারল না রবিন। তাকে শান্ত হওয়ার সময় দেয়া হলো। দুধ মেশানো ব্র্যান্ডি খেতে দিল ওমর।

খেয়েটেয়ে সুস্থির হয়ে সব কথা খুলে বলল রবিন।

প্রথমে তো বিশ্বাসই করতে চাইল না কেউ। তারপর কিশোর বলল, 'চলো, এখনই যাব।'

'এখনই' বললেও তখুনি রওনা হওয়া গেল না। গেল না মানে যেতে দিল না ওমর। বলল, 'পাওয়া যখন গেছে এত তাড়াহুড়া নেই। দুপুরের খাওয়া খেয়ে তারপর বেরোব।'

আবার যখন বেরোল ওরা, বিকেল শেষ হয়ে এসেছে, অবশ্য ঘড়ির কাঁটায়। সূর্য দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। আবার

anmsumon@yahoo.com www.murchona.com

দিগন্তের কাছে মস্ত একটা লাল বলের মত ঝুলে থাকতে দেখা যাচ্ছে সূর্যটাকে। আকাশ পরিষ্কার। কিন্তু যন্ত্রপাতি দেখে ক্যাম্পবেল বললেন, তাপমাত্রা বাড়ছে। আবহাওয়ার এই পরিবর্তনে ঘন কুয়াশার সৃষ্টি আর সেই সঙ্গে প্রবল তুষারপাত হতে পারে।

রবিনকে ক্যাম্প পাহারায় রেখে আসা হয়েছে। রেখে আসার কারণ, তার ওপর দিয়ে ধকল গেছে। খানিক বিশ্রাম দরকার। কাঠ পুঁতে চিহ্ন রেখে গেছে রবিন, ওকে ছাড়াই জাহাজটা খুঁজে বের করতে পারবে কিশোররা।

চিহ্নগুলো না সরিয়ে খুব ভাল করেছে রবিন। জাহাজটার কাছে ফিরে আসতে কোন অসুবিধে হলো না ওদের। বরফের ওপর কাত হয়ে পড়ে থাকা ক্রুশটার কাছে এসে থামল ওরা। তুলে নিয়ে খোদাই করে লেখা নামটা পড়ল কিশোর।

জাহাজটা দেখতে পেল। আগে আগে চলল ওমর। ঠিক তার পেছনেই রয়েছে কিশোর। খোলের গা ঘেঁষে তৈরি রাখা বরফের সিঁড়িটার দিকে হাত তুলে ইঙ্গিত করল নীরবে।

ডেকে উঠে এল ওমর। কিশোর আর ক্যাম্পবেলও উঠে এলে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'এখানে দাঁড়ান।' একা এগোল গর্তটার দিকে। নিচে উঁকি দিয়ে শিস দিয়ে উঠল। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে কিশোরকে বলল, 'দারুণ দৃশ্য!' আবার গর্তের নিচে তাকিয়ে চিৎকার করে ডাকল, 'এই, কেউ আছেন?'

সাড়া দিল না কেউ।

চোখের কোণ দিয়ে ডেকের শেষ মাথায় একটা নড়াচড়া দেখতে পেল কিশোর। ঝট করে ফিরে তাকাল। কালো বলের মত একটা জিনিস। কসম খেয়ে বলতে পারে, মুহূর্ত আগেও ছিল

না ওটা ওখানে। মানুষের মাথা নাকি? চুল লেপ্টানো মুখের একটা অংশ দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হলো তার। ভাল করে দেখার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা।

রবিন কেন দৌড় দিয়েছিল বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের। একা হলে এখন সে নিজেও ছুটে পালাত। এ রকম পরিবেশে এ ধরনের ভূতুড়ে কাণ্ড অতি বড় সাহসীরও বুক কাঁপিয়ে দিতে পারে। অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে।

ফিরে তাকাল ওমর, 'কি হলো?'

ঢোক গিলল কিশোর। 'একটা মাথা। দাড়ি-গোঁফ আর বড় বড় চুলওয়ালা।'

'কোথায়?'

হাত তুলল কিশোর, 'ওদিকে। আমি তাকাতেই সরে গেল।'

'চমৎকার! রবিনের রহস্যময় চোখটা তাহলে একটা মাথাও খুঁজে পেয়েছে এখন! সত্যি দেখেছ?'

'তাই তো মনে হলো।'

সেদিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ডাকল আবার ওমর, 'কে ওখানে?'

এবারও কেউ সাড়া দিল না। দেবে আশাও করেনি সে। দুজনকে দাঁড়াতে বলে এক পা এগোল। হঠাৎ একপাশে ছুঁড়ে ফেলল নিজেকে। কানের পাশ দিয়ে শাঁ করে চলে গেল একটা কুড়াল। কারও কোন ক্ষতি না করে পেছনের বরফ হয়ে থাকা দড়িতে গিয়ে লাগল। বরফের গুঁড়ো আর চটা ছিটকে পড়ল।

উঠে দাঁড়াল আবার ওমর। পকেট থেকে পিস্তল বের করে সামনে তুলে ধরে চিৎকার করে ডাকল, 'আই, বেরিয়ে এসো!'

জবাবে শোনা গেল উন্মাদের হাসি। ঘাড়ের রোম খাড়া করে

দিল কিশোরের। মনে হলো যেন ওদের পায়ের নিচের বরফ ভেদ করে বেরিয়ে আসছে হাসিটা।

ফিরে তাকাল ওমর, 'খোলের মধ্যে কেউ আছে!'

'থাকলে ভূত আছে,' ক্যাপ্টেনের কণ্ঠে অস্বস্তি, 'আর কে হবে?'

'ভূত বিশ্বাস করেন নাকি আপনি?'

'না।'

'ভূত হোক আর যে-ই হোক, পঁয়তাল্লিশ ক্যালিবারের সফট-নোজ বুলেটের সঙ্গে কি করে এঁটে ওঠে দেখতে চাই...'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই জাহাজের গভীর থেকে ভেসে এল গোঙানি মেশানো একটা কণ্ঠ, 'চলে যাও। চলে যাও। সোনাগুলো আমার। আমি নিতে দেব না।'

'জলদি বেরোও!' গর্জে উঠল ওমর। 'নইলে গুলি খাবে!'

ডেকটা যেখানে বরফের ভারে ধসে পড়েছে, সেই গর্ত দিয়ে লাফিয়ে বেরোল একটা মূর্তি। দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ। লম্বা লম্বা চুল কান ঢেকে দিয়ে গালে এসে পড়েছে। দু'হাতে ধরে রেখেছে একটা সোনার বার। ওমর ভাবল তার মাথায় ওটা দিয়ে বাড়ি মারতে এসেছে পাগলটা। আরও উঁচু করে ধরল পিস্তল। কিন্তু বাড়ি মারল না লোকটা। সোনার বারটা কাঁধে তুলে নিয়ে দৌড় দিল। কাত হয়ে থাকা পিচ্ছিল ডেকে পিছলে পড়তে পড়তেও পড়ল না। চোখের পলকে ডেক থেকে নেমে হারিয়ে গেল তুষারপাতের মধ্যে। বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে আছে সবাই, বাধা দেয়ার কথাও মনে ছিল না।

সবার আগে নড়ে উঠল কিশোর। চিৎকার করে পিছু নিতে গেল তার।

পেছনে এসে দাঁড়াল ওমর। বাধা দিয়ে বলল, 'পিছু নিয়ে লাভ নেই। এই তুষারে ওকে খুঁজে পাবে না। জায়গাটা আমাদের চেয়ে ভাল চেনে ও।'

'কিন্তু লোকটা কে?' কিশোরের প্রশ্ন।

চিন্তিত ভঙ্গিতে ক্যাপ্টেন বললেন, 'লোকটা কে অনুমান করতে পারছি, দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলের জন্যে যদিও চেনা কঠিন; ও জেনসেন। পছন্দ করত না বলে যাকে ফেলে গিয়েছিল পোত্রামাই। তারমানে জেনসেন মরেনি, বেঁচে আছে।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর, 'চোখ রহস্যের সমাধান তাহলে হয়ে গেল।'

নিচে ফিরে এল আবার তিনজনে। রবিনের কথামত ঘরটা খুঁজে বের করল। টেবিলটাও আছে। কিন্তু তার ওপরে সোনার বারগুলো নেই। গেল কোথায়?

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। ওমর আর ক্যাম্পবেলের দিকে তাকাল, 'কোথায় আছে, জানি। আসুন আমার সঙ্গে।'

জেনসেন যেখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সেখানে এসে দাঁড়াল সে। নিচে নামার সিঁড়ি কেটে রেখেছে এখানেও। নিচে নেমে বরফে একটা গর্ত দেখিয়ে বলল, 'ওই দেখুন। টেবিল থেকে সরিয়ে এনে সোনাগুলো লুকিয়ে ফেলতে চেয়েছিল জেনসেন। কাজ শেষ করতে পারেনি। আমরা আসতে আর আধঘণ্টা দেরি করলেই গর্তের মুখ বরফ দিয়ে বন্ধ করে দিত সে। কোনদিনই হয়তো আর খুঁজে পেতাম না এগুলো।'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন ক্যাপ্টেন। দুই হাত প্যান্টের পকেটে। 'নেব কি করে এখন? তাঁবুতে বয়ে নিতে জান কাবার হয়ে যাবে।'

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com ©

'অত কষ্ট করতে যাচ্ছিও না,' ওমর বলল। 'প্লেনটাই নিয়ে আসব এখানে। জাহাজের কাছাকাছি রেখে তাতে নিয়ে তুলব।'

'নামাতে পারবেন? জায়গা আছে?'

'আছে।'

'চলুন তাহলে, দেরি করার দরকার নেই। তুষার পড়া বেড়ে গেলে সমস্যা হয়ে যাবে।'

'কিন্তু এখানে সোনাগুলো ফেলে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না,' কিশোর বলল। 'জেনসেন ফিরে এসে দেখলে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলতে পারে।'

ভুরু কুঁচকে তাকাল ওমর, 'তা ঠিক। কি করতে চাও?'

'জাহাজ থেকে বের করে নিয়ে যাই। আমি বসে বসে পাহারা দেব, আপনারা গিয়ে প্লেনটা নিয়ে আসবেন। মুসাকেও মেসেজ পাঠানো দরকার, চলে আসুক। একসঙ্গে দুটো প্লেন হলে একবারেই সব সোনা তুলে নিয়ে চলে যেতে পারব, ফিরে আসা লাগবে না আর।'

কিশোরের কথায় একমত হলো ওমর আর ক্যাম্পবেল। কিন্তু সোনাগুলো বের করতে গিয়ে বুঝতে পারল কতটা কঠিন কাজ। একবারে একজনের পক্ষে একটার বেশি বার বয়ে নেয়া সম্ভব হলো না। দু'হাতে বওয়ার চেয়ে কাঁধে তুলে নিলে অনেকটা সহজ হয়, জেনসেনের নেয়া দেখেই বুঝতে পেরেছিল। ওরাও তা-ই করল।

বারগুলোকে বের করে এনে একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে রাখা হলো। তার ওপর বসে পড়ে কিশোর বলল, 'আপনারা চলে যান।'

'সত্যি একা থাকতে পারবে তুমি?' ক্যাপ্টেনের কণ্ঠে অস্বস্তি।

'না পারার কি আছে?'

'জেনসেন পাগল হয়ে গেছে!'

'তাতে কি?' হাসল কিশোর। 'তুষারপাত বাড়লে আমাকে দেখতেই পাবে না জেনসেন। আর কম থাকলে ও যেমন আমাকে দেখতে পাবে, আমিও ওকে দেখতে পাব। পিস্তল তো আছেই পকেটে। পিস্তলকে পাগলেও ভয় পায়, দেখলেনই তো।'

'কিন্তু আমার যাওয়ার কি দরকার আছে?'

'আছে। জিনিসপত্র যা যা দরকার, নিয়ে একবারে চলে আসবেন। শুধু শুধু ওখানে ফিরে যাওয়ার আর কোন মানে হয় না। এখান থেকেই দেশে রওনা হয়ে যাব আমরা।'

'দেশে রওনা হয়ে যাব' কথাটা শুনতে খুব মধুর শোনালেও নিশ্চিত হতে পারল না ওমর। এত সহজে, নির্বিঘ্নে এই বরফের রাজ্য থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে, এটাও বিশ্বাস করতে পারছে না। তা ছাড়া জেনসেনের কি হবে? একজন অসুস্থ মানুষকে একা ফেলে যাওয়াটা ঠিক হবে না মোটেও। যে করেই হোক তাকে খুঁজে বের করে এনে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

'থাক, পরের ভাবনা পরে' ভেবে ক্যাম্পবেলকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল সে।

বসে বসে ওদের যাওয়া দেখল কিশোর। এক টন খাঁটি সোনাকে আসন বানানো–ভাবতেও অবাক লাগল তার। বিশ্বাস হতে চাইছে না। নিচের দিকে তাকাল। তলার বারগুলো দেখা যাচ্ছে না। বরফে ডেবে গেছে। ভারের চোটে ওপরেরগুলোও যাবে শীঘ্রি। এটা দেখেই কথাটা মাথায় এল তার। কোন কারণে বারগুলোকে এখন এ ভাবে ফেলে যেতে বাধ্য হলে ফিরে এসে আর খুঁজে পাবে না। একটা চিহ্ন দিয়ে রাখা দরকার। রবিনের পুঁতে যাওয়া একটা কাঠের ফালির ওপর চোখ পড়ল। তুলে এনে

ahmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

দুটো বারের মাঝে দাঁড় করিয়ে রাখল ওটা। বার দুটো চেপে দিতেই কাত হয়ে পড়ল না আর ফালিটা, দাঁড়িয়ে রইল সোজা হয়ে।

আবার সোনার বিচিত্র আসনে বসল সে। চারপাশে তাকাতে লাগল। সাদা বরফের একঘেয়ে দৃশ্য দেখছে না, তার চোখ খুঁজছে পালিয়ে যাওয়া লোকটাকে। ফিরে আসে কিনা দেখছে।

গড়িয়ে গড়িয়ে কাটছে সময়। ভীষণ ঠাণ্ডা। হাঁটাচলা করলে মোটামুটি সহ্য করা যায়, কিন্তু বসে থাকলে কাঁপুনি তুলে দেয়। তার ওপর ভয়াবহ একঘেয়েমি, নীরবতা আর নিঃসঙ্গতা। এই বরফের রাজ্যে আটকা পড়লে কেন পাগল হয়ে যায় মানুষ, বুঝতে সময় লাগল না তার। মাথার মধ্যে যেন কুরে কুরে খেতে থাকে, একটানা চাপ দিতে থাকে স্নায়ুর ওপর।

দূরে প্লেনটা স্টার্ট নেবার শব্দ কানে আসতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। ইঞ্জিনের পরিচিত শব্দটা যেন মধুবর্ষণ করল কানে। কিছুক্ষণ চলে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। আবার চালু হলো। আবার বন্ধ।

কান খাড়া করে ফেলল সে। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে লাগল। চালু হয়ে বন্ধ হচ্ছে কেন? ইঞ্জিনে গোলমাল? উড়তে পারছে না?

অস্থির হয়ে উঠল সে। উদ্বেগটা সহ্য করতে পারছে না। উঠে দাঁড়াল। ঘন ঘন তাকাতে লাগল ক্যাম্পের দিকে। কিন্তু আর শোনা গেল না শব্দ। কিছু দেখাও গেল না। এতক্ষণ উত্তেজনায় লক্ষ করেনি, হঠাৎ খেয়াল করল তুষারপাত বেড়ে গেছে। সমস্ত চরাচর ঢেকে দিতে যেন স্বর্গ থেকে অবিরাম নেমে আসছে তুষারের ধূসর পালকগুলো। মনটাকেও যেন ধূসর করে তুলল তার।

সাত

বিপদেই পড়েছে ওমর। বার বার চেষ্টা করেও বিমানটাকে তুলতে না পেরে শঙ্কিত হলো। শেকড় গেড়ে ফেলেছে যেন বিমানটা। একবিন্দু নড়ছে না। শেকড়? সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলল কি ঘটেছে। রবিন আর ক্যাম্পবেলকে নামতে বলে নিজেও উঠে দাঁড়াল।

তার অনুমান ঠিক। নিচে নেমে একবার তাকিয়েই নিশ্চিত হয়ে গেল। বরফে আটকে গেছে স্কি দুটো। ইস্‌, আগেই ভাবা উচিত ছিল। তুলতে হয়তো পারা যাবে, কিন্তু আগে থেকে ব্যবস্থা নিয়ে রাখলে এই সমস্যায় পড়া লাগত না।

'ইঞ্জিন দিয়ে টেনে তোলা যায় না?' ক্যাপ্টেন বললেন।

'নাহ্‌, জোর করতে গেলে হঠাৎ যদি খুলে আসে বরফ থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়বে, কিংবা উল্টে যাবে। এখানে ওরকম ডিগবাজি খাওয়ানোর ঝুঁকি নেয়া যায় না।'

'তাহলে কি করবেন?'

এক মুহূর্ত ভাবল ওমর। রবিনের দিকে তাকাল, 'রবিন, ছেনি আর হাতুড়ি বের করো। বরফ কেটে ফেলব।'

বরফের অঞ্চলে বরফ কাটা, সে-ও সহজ ব্যাপার নয়। এক জায়গায় কেটে এগোতে না এগোতে আবার আগের মত জমে যায়। বাধা হয়ে কাটা জায়গায় স্কি'র নিচে বাক্স কেটে প্যাকিং

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

নেয়া লাগল।

ধীর গতিতে কাজ এগোচ্ছে। ওমর বরফ কাটছে। রবিন প্যাকিং দিচ্ছে। ক্যাম্পবেলও বসে নেই, বড় একটা স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে অন্য পাশের স্কি থেকে যতটা সম্ভব খুঁচিয়ে বরফ তোলার চেষ্টা করছেন।

বিমানটাকে বরফ থেকে তোলা নিয়ে ভাবছে না ওমর, তোলা যাবেই, দুশ্চিন্তাটা কিশোরের জন্যে। তুষারপাত বেড়ে গেলে খোলা জায়গায় বিপদে পড়ে যাবে সে। আশ্রয় বলতে ওই জাহাজের খোলটা ছাড়া আর কোন জায়গা নেই। সেখানে ঢোকাটা বিপজ্জনক। পাগল জেনসেন ফিরে এলে যে কোন অঘটন ঘটিয়ে বসতে পারে।

স্কি দুটো মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ককপিটে বসল ওমর। স্টার্ট দিয়ে থ্রটল ওপেন করতেই কেঁপে উঠল বিমান। হয়ে গেছে। ওড়া যাবে এখন। রবিন আর ক্যাম্পবেলকে উঠতে বলল।

আকাশে উড়ল বিমান। নিচে থেকে যতটা ভাল দেখা যাচ্ছিল, ওপর থেকে তা যাচ্ছে না। দিগন্ত বলতে এখন কিছু চোখে পড়ছে না। নিচের দিকে সামান্য একটুখানি গোল জায়গা কেবল দৃষ্টিগোচর হয়, অন্ধকার রাতে টর্চের আলো ফেললে যেমন কিছুটা জায়গা দেখা যায়, অনেকটা তেমনি। তুষারের পর্দার আড়ালে সূর্যটাকে লাগছে আবছা একটা কমলা বলের মত।

মাত্র পাঁচশো ফুট ওপর দিয়ে উড়ে চলল সে। কয়েক মিনিট পর নিচে তাকিয়ে কিশোরকে দেখার চেষ্টা করল। দেখতে পেল না। তুষারপাতের মাঝে সব সাদা হয়ে গেছে। তবে বরফের দেয়াল দেখে জাহাজটা কোনখানে আছে মোটামুটি ঠাহর করা যাচ্ছে। কিশোরকে দেখতে পাওয়ার ভাবনাটা আপাতত মন থেকে

দূর করে দিয়ে বিমান নামানোর চিন্তা করতে লাগল সে।

নামাতেও অসুবিধে হলো না তেমন। বিমানটা থামার সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে নেমে গেল রবিন। দ্বিতীয়বার আর স্কি দুটোকে বরফে ডুবতে দিতে চায় না। তাড়াতাড়ি বাক্সের প্যাকিং ঢোকাতে শুরু করল স্কি'র তলায়।

ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে নেমে এসে ওমর জিজ্ঞেস করল, 'হয়েছে?'

মাথা নাড়ল রবিন, 'হয়েছে।'

'মুসার সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। ওদের বলেছি, সোনাগুলো পাওয়া গেছে। দেরি না করে যেন চলে আসে। ওরা তো আসবে ঠিকই, ভয় পাচ্ছি আবহাওয়াকে। তুষারপাত আরও বাড়লে এসে শেষে দেখতেই পাবে না আমাদের।'

কথা বলতে বলতেই চারপাশে তাকিয়ে কিশোরকে খুঁজছে ওমর। 'কিশোর গেল কোথায়?'

রবিনও চারপাশে তাকাল। ক্যাম্পবেলও দেখছেন। কারও মুখে কথা নেই।

কপালে ভাঁজ পড়ল ওমরের। 'জায়গা ঠিক আছে তো?'

'কোন সন্দেহ নেই।' হাত তুলে দেখালেন ক্যাপ্টেন। 'ওই যে জাহাজটা। এখানেই রেখে গিয়েছিলাম কিশোরকে। হলো কি ওর? সোনাগুলোও তো দেখছি না।'

'জাহাজে গিয়ে ঢোকেনি তো?' রবিন বলল।

'তা তো ঢুকতেই পারে, কিন্তু সোনাগুলো?' ক্যাপ্টেন বললেন। 'কি করে নেবে?'

'তুষারে ঢেকে গিয়ে থাকতে পারে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল

ahmsuman@yahoo.com
www.murchona.com

ওমর। 'একটা কথা জোর দিয়ে বলা যায়, কিশোর যেখানেই যাক না কেন, সোনাগুলো আগের জায়গাতেই আছে। এত সোনা এত তাড়াতাড়ি একা সরানো সম্ভব নয় তার পক্ষে।' ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল সে, 'আসলেই ঠিক জায়গায় এসেছি তো আমরা?'

'হ্যাঁ,' নির্দ্বিধায় জবাব দিলেন ক্যাম্পবেল। 'আপনার সন্দেহের কারণটা কি?'

'কি যেন একটা পরিবর্তন হয়েছে।'

'কি?'

'বুঝতে পারছি না।' আরেকবার চারপাশে তাকিয়ে কিশোরকে দেখার চেষ্টা করল। না পেয়ে চিৎকার করে ডাকল, 'কিশোর!'

জবাব এল না।

ক্যাম্পবেলের দিকে তাকাল আবার ওমর, 'ঘটনাটা কি, বলুন তো? সত্যি জায়গা ভুল করিনি আমরা, নাকি পাগল হয়ে গেছি?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে জবাব দিলেন ক্যাম্পবেল, 'জায়গাও ভুল করিনি, পাগলও হইনি।' মুখের কাছে হাত জড় করে কিশোরের নাম ধরে নাবিকসুলভ এক হাঁক ছাড়লেন।

জবাব এল না।

ওমর আর রবিনকে ওখানে থাকতে বলে দৌড়ে গিয়ে জাহাজটায় দেখে এলেন তিনি। ওখানেও নেই।

আকাশের দিকে পিস্তল তুলে গুলি করল ওমর। শব্দটা কেমন ভোঁতা আর নিষ্প্রাণ শোনাল। খোলা সাগরের দিক থেকে ভেসে এল আরেকটা গুলির মৃদু শব্দ।

নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে ক্যাপ্টেন বললেন, 'প্রতিধ্বনি। আপনার গুলির শব্দটাই আইসবার্গে বাড়ি খেয়ে ফিরে এসেছে।'

মেনে নিতে পারল না ওমর। তবে জবাবও দিতে পারল না।

খোলা সাগরের দিকে যাবে কেন কিশোর, কোন যুক্তি খুঁজে পেল না।

*

তবে যুক্তিটা সহজ। সাময়িক উত্তেজনায় ক্যাম্পবেলের মত পোড়খাওয়া, দক্ষিণ মেরু ঘুরে যাওয়া নাবিকের মাথায়ও প্রথমবারে ব্যাপারটা ঢোকেনি।

সোনার বারের ওপর বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হলো কিশোরের, নড়ে উঠেছে ওগুলো। ভুরু কুঁচকে গেল। মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে নাকি? কিন্তু আবার নড়ে উঠল ওগুলো; ঠিক নড়া নয়, কেঁপে উঠল বলা যায়। ঘটনাটা কি? ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি? দক্ষিণ মেরুতে ভূমিকম্প? বাতিল করে দিল সন্দেহটা। তবে নয়ই বা কেন? পৃথিবীর সবখানেই যদি ভূমিকম্প হতে পারে, দক্ষিণ মেরুতে হলে দোষটা কি?

ঘুরে তাকাতে জাহাজটার দিকে চোখ পড়ল ওর। চমকে গেল। সত্যি সত্যি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে নাকি? জাহাজটা দূরে সরে গেছে। আরও একটা জিনিস চোখে পড়তেই ধড়াস করে উঠল বুকের ভেতর। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। বরফের মধ্যে চওড়া, আঁকাবাঁকা, দীর্ঘ একটা ফাটল তৈরি হয়েছে। ক্রমেই বাড়ছে ফাঁকটা। বুঝে ফেলল কি ঘটেছে। মূল বরফখণ্ড থেকে খসে গেছে একটা অংশ, যেটার ওপর বসে আছে সে; সরে যাচ্ছে খোলা সাগরের দিকে।

ফাঁকটার কাছে দৌড়ে এল সে। ইতিমধ্যেই সাত-আট হাত সরে গেছে। লাফিয়ে পেরোনো অসম্ভব। ছয় ফুট নিচে কালো পানি। এই বরফ শীতল পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটার চেষ্টা করা আত্মহত্যার সামিল। পানিতে পড়লে একটা মিনিটও

emonsumon@yahoo.com
www.murchona.com

টিকবে না।

পেছনে তাকাল। ওদিকে ফাঁক কম। দৌড় দিল। কিন্তু সে ওখানে পৌছতে পৌছতে বেড়ে গেল ফাঁক। পেরোনো অসম্ভব। আরও আগে বুঝতে পারল না কেন ভেবে নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল এখন।

এই মরণ-ফাঁদ থেকে বেরোনোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল সে। চারপাশে তাকাতে লাগল। কোন উপায় দেখতে পেল না। যেদিকে তাকায় শুধুই বরফ আর বরফ, ছোট-বড় বরফের চাঙড় তুষারপাতের কারণে খুবই অস্পষ্ট চোখে পড়ে; আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় স্থির হয়ে আছে, আসলে ভেসে ভেসে সরে যাচ্ছে সবগুলোই। সরাটা এমনই, বোঝা যায় না।

সে যেটাতে রয়েছে, ভাল করে দেখল সেটা। অনেকটাই বড়, কিন্তু বিমান নামানোর জন্যে যথেষ্ট নয়। ল্যান্ড করার মত জায়গা নেই। ওমর যদি আসেও, নামতে পারবে না। বিমানে অবশ্য একটা রবারের ভেলা রয়েছে। সেটা ফেলে দিতে পারে। কিন্তু তাতে কতটা লাভ হবে কে জানে! বাতাস ভরে ফোলাতে হয় ভেলাটা, খোঁচা লেগে ফুটো হয়ে বাতাস বেরিয়ে গেলেই শেষ। এখানে যা অবস্থা, চোখা বরফে খোঁচা লাগার সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্তে। তবু ওটাতে করে মূল বরফখণ্ডে গিয়ে ওঠার ক্ষীণ একটা আশা করা যেত, যদি ওমর ওকে খুঁজে পেত। পাওয়াটা কঠিন, প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। তুষারপাতের কারণে দৃষ্টি চলে না বেশিদূর। তা ছাড়া ওমরও যে বড় রকমের বিপদে পড়েনি সেটাই বা কে বলতে পারে! যে ভাবে ইঞ্জিন স্টার্ট নিল আর বন্ধ হলো, কি অবস্থায় আছে সে খোদাই জানে!

মূল বরফখণ্ড থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছে কিশোর যে

টুকরোটাতে রয়েছে সেটা। গতি দেখে অনুমান করা গেল স্রোতের মধ্যে পড়েছে। উত্তর-পুবে এগোচ্ছে। মনে মনে এই এলাকার ম্যাপটা কল্পনা করে অঙ্ক করা শুরু করে দিল সে। গ্র্যাহাম পেনিনসুলার উত্তরের বাহুটা রয়েছে প্রায় একশো মাইল দূরে। সেখানে পৌছতে পৌছতে...নাহ্, আশা করা পাগলামি। অতটা দূরে যেতে যেতে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাহিল হয়ে, তুষারপাতের মধ্যে ঠাণ্ডায় জমেই মরে যাবে। কিংবা আরও সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটতে পারে। উত্তরে স্রোতে পড়ে এগোতে গিয়ে গলে যেতে পারে টুকরোটা—আশেপাশে ছোট ছোট বরফের টুকরোগুলোকে গলতে দেখছে সে; তাতে এক সময় টুপ টুপ করে পানিতে পড়তে থাকবে সোনার বারগুলো, সে নিজেও পড়বে...

সোনার বার! হাহ্ হাহ্! তিক্ত হাসি হাসল সে। এগুলোর কোন অর্থই নেই তার কাছে এ মুহূর্তে। অতি সাধারণ একটা ডিঙির জন্যেও অকাতরে দিয়ে দিতে পারে সব।

বাঁচার আশা ছেড়ে দিল সে। বরফের কিনারে দাঁড়িয়ে পানির দিকে তাকিয়ে থাকার আর কোন অর্থ হয় না। ধীর পায়ে ফিরে এসে বসে পড়ল আবার আগের জায়গায়। বসে বসে ভাবতে লাগল। চারপাশে বরফের টুকরো ভেসে বেড়াচ্ছে, ধাক্কা লাগছে, ঘষা খাচ্ছে একটার সঙ্গে আরেকটা। আরেকটা বড় টুকরোর সঙ্গে ধাক্কা খেল ওর টুকরোটা। থরথর করে কেঁপে উঠল। বিকট গর্জন আর কড়মড় আওয়াজ তুলে ভাঙল কিছু বরফ। একটা আরেকটার সঙ্গে লেগে গেল শক্ত হয়ে। সহজে ছুটবে বলে আর মনে হয় না। কিন্তু আশা করতে পারল না সে। জোড়া লেগেও ততটা বড় হয়নি বরফ যাতে প্লেন ল্যান্ড করতে পারে।

এই সময় কানে এল ইঞ্জিনের শব্দ। বিমানের ইঞ্জিন। বক

ahmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

করে উঠল বুকের মধ্যে। এর একটাই মানে, উড়ে যাচ্ছে ওমরভাই। এদিকে কি আসবে? কোন কারণ নেই আসার। তবু আশায় দুলতে লাগল তার মন। কান পেতে রইল সে। থেমে গেল ইঞ্জিনের শব্দ। তারমানে ল্যান্ড করেছে বিমানটা। আরও কিছুক্ষণ পর শোনা গেল গুলির শব্দ।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল আবার কিশোর। পকেট থেকে পিস্তল বের করে গুলির শব্দের জবাব দিল। কিন্তু গুলি ফোটার শব্দ শুনে আবার মনটা দমে গেল তার। অদ্ভুত এই অঞ্চলে পিস্তলের গুলি ফোটার শব্দটা পর্যন্ত স্বাভাবিক শোনা যায় না। আশা করতে লাগল জবাবে আবার গুলির শব্দ হবে। হলো না। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে আবার নিরাশ হয়ে পড়ল সে। ওটা আদৌ গুলির শব্দ ছিল কিনা সন্দেহ হতে লাগল।

আবার বসে পড়ল বারগুলোর ওপর। কান পেতে রইল শব্দ শোনার আশায়। পকেট থেকে চকলেট বের করে খেল।

সময় কাটছে। উত্তেজনার মধ্যে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে। শুয়ে পড়তেও ভয় পাচ্ছে। ঘুমের মধ্যেই যদি তুষারে ঢেকে যায়।

ঘড়ি দেখাও ছেড়ে দিল একসময়। ক্লান্তিতেই বোধহয় চোখটা লেগে এসেছিল, মাথাটা বুকের কাছে ঝাঁকি খেতেই তন্দ্রা টুটে গেল। ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসল। সামনের দিকে তাকাতে চোখে পড়ল জাহাজটা।

তিক্ত হাসি হাসল সে। পাগল হওয়ার লক্ষণ। উল্টোপাল্টা দেখা শুরু হয়ে গেছে। চোখ মুদল। আবার খুলল। আছে জাহাজটা।

কয়েকটা মিনিট চুপচাপ বসে তাকিয়ে রইল ওটার দিকে।

গেল না ওটা। মুছল না চোখের সামনে থেকে। বরং এগিয়ে আসছে। ডেকে লোকজনের চলাফেরাও দেখতে পেল। নিশ্চিত হওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল কয়েক পা। মাথা ঝাড়া দিল। চোখ ডলল। তারপরও যখন অদৃশ্য হলো না জাহাজটা, চিৎকার করে ডাকতে শুরু করল সে।

জাহাজ থেকে শুনতে পেল ওর চিৎকার। রেলিঙের কাছে জড় হলো কয়েকজন মানুষ। তাকিয়ে রইল এদিকে। ধীরে ধীরে ঘুরে যেতে শুরু করল জাহাজের নাক।

নিজের গালে চিমটি কেটে দেখল কিশোর জেগে আছে না স্বপ্ন দেখছে। এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না তার।

কাদের জাহাজ? তিমি শিকারী নাকি সীল শিকারীদের? একটিবারের জন্যেও মাথায় এল না তার যে ওটা পেত্রাঘাইয়ের জাহাজ। মাথা শান্ত রেখে ভাবার মত পরিস্থিতিও নয়। জাহাজটা আরও কাছে এলে ওটার নামটা পড়ে চমকে গেল : বেত্রাঘাই। এতক্ষণে বিশ্বাস হলো, স্বপ্ন দেখছে না। একমাত্র পোত্রাঘাইয়েরই এদিকে আসার কথা ছিল। এসেছে। আর এসেছে একেবারে সময়মত। তবে ওকে দেখে শঙ্কিত হওয়ার চেয়ে বরং খুশি হলো সে। নিশ্চিত মৃত্যুর সম্ভাবনায় কিছুটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছে। যদিও, পোত্রাঘাইয়ের হাতে পড়লেও মরার সম্ভাবনা কম নয়। সোনাগুলো দেখে আনন্দে আত্মহারা হবে পোত্রাঘাই, কোন সন্দেহ নেই। এত সহজে হাতের কাছে চলে আসবে ওগুলো নিশ্চয় কল্পনাই করেনি সে। জাহাজে তুলে নেবে। কিশোরকে তুলে নেয়াটা তার জন্যে ঝামেলা। তারচেয়ে মাথায় একটা বাড়ি মেরে বেহুঁশ করে বরফের ওপর তাকে ফেলে রেখে জাহাজ ভর্তি সোনা নিয়ে হাওয়া হয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। কেউ জানবে না

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

আমাদের রেডিওম্যান, তাতে কোন একটা জাহাজ খুঁজে পাওয়ার কথা বলা হয়েছে।'

কি ঘটেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের। রেডিওতে মুসাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে রবিন, সেটা ধরা পড়েছে বেত্রাঘাইয়ের রেডিওতেও। তারমানে পোত্রাঘাইয়ের এদিকে আসাটা কাকতালীয় নয়। সাবধানে কথা বলতে হবে এখন, নইলে বিপদ বাড়বে। বলল, 'হ্যাঁ, আমাদের ক্যাম্পের কাছে একটা জাহাজ পাওয়া গেছে। ওটার কাছ থেকে দূরে থাকার অনুরোধই করব আপনাকে।'

'কেন?' তীক্ষ্ণ হলো পোত্রাঘাইয়ের কণ্ঠ।

'ওটাতে পাগলের বাস···কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলছি আমি সেটাই তো জানা হলো না।'

'আমার নাম পোত্রাঘাই, এই জাহাজের মালিক,' দায়সারা জবাব দিল সে। 'পাগলটার নাম কি?'

'তা কি করে বলব? জাহাজে কেউ আছে কিনা দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদের দিকে কুড়াল ছুঁড়ে মারল পাগলটা। চিৎকার করে গালাগাল করতে লাগল। তাকিয়ে দেখি দৈত্যের মত এক লোক। বড় বড় লাল লাল চুল।'

ঝট করে ঘুরে সঙ্গীদের দিকে তাকাল পোত্রাঘাই। 'কি বলল শুনলে? লাল লাল চুল। ওখানেই গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে তাহলে। করব, ওর ব্যবস্থাও করা যাবে।' কিশোরের দিকে ফিরল আবার, 'জাহাজের ভেতরে ঢুকেছিলে?'

শুকনো হাসি হাসল কিশোর। 'ভেতরে আর ঢুকি কখন। মাত্র তিনটে মিনিট ছিলাম ডেকে। প্রথমে কুড়াল ছুঁড়ে মারল, তারপর চিৎকার···পাগলটার চোখের দিকে তাকিয়ে আর দাঁড়ানোর সাহস

করলাম না। ঝেড়ে দিলাম দৌড়।'

দ্বিধা করতে লাগল পোত্রাঘাই। কেন, বুঝতে পারল কিশোর। আসল প্রশ্নটা আসছে। বলেই ফেলল শেষে পোত্রাঘাই, 'জাহাজে কোন দামী জিনিস দেখেছ?'

সব কটা মুখে উত্তেজনা দেখতে পেল কিশোর। জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে লোকগুলো। 'দামী মানে?'

'ধরো, সোনাটোনা জাতীয় কিছু?'

হাসল কিশোর। 'গুপ্তধনের কথা জানতে চাইছেন? নাহ্, দেখিনি। সময় পেলাম কোথায়? পাগলের তাড়া খেয়ে পালিয়ে বাঁচি না···যদি থাকেই, সব নিয়ে নিনগে আপনি। আমি যে প্রাণে বাঁচলাম এটাই যথেষ্ট।'

'হুঁ!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল পোত্রাঘাই। 'যাও, নিচে যাও। সময় হলে ডাকব।'

'থ্যাংকস,' কিশোরের ধন্যবাদটা আন্তরিক।

আট

কিশোরের কি ঘটেছে দেরিতে হলেও বুঝতে পারল ওমর। বিমানে করে পানির ওপরে চক্কর দিয়ে আসার কথা ভাবল।

বাধা দিলেন ক্যাম্পবেল। না যাওয়ার সপক্ষে দুটো যুক্তি দেখালেন। প্রথম যুক্তিটা হলো, ভেঙে যাওয়া বরফখণ্ডটা কত বড়

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com
(c)

জানা নেই। ছোট হয়ে থাকলে সোনার ভারে উল্টে যাবে। তাতে সোনাগুলোও পড়বে সমুদ্রে, কিশোরও রেহাই পাবে না। যদি না-ও ওল্টায়, একপাশে কাত হয়ে যাবে, তাতেই রেহাই পাবে না সে। তারমানে বহু আগেই মরে গেছে কিশোর। মরা মানুষকে খুঁজতে যাওয়া কিছুটা আগে আর আগে পরে, একই কথা। দ্বিতীয় যুক্তিটা হলো, আকাশ অপরিষ্কার, দেখা যায় না ভালমত। কিশোরকে খুঁজতে হলে নিচু দিয়ে উড়ে যেতে হবে, তাতে না দেখতে পেয়ে আইসবার্গে ধাক্কা খেয়ে বিমানটা ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা একশো ভাগ। যেতে হলে আবহাওয়া ভাল হওয়ার অপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ। কিশোর যদি পানিতেই পড়ে গিয়ে থাকে, ঘণ্টাখানেক পরে খুঁজতে গেলেও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। আর যদি অলৌকিক ভাবে বেঁচেও যায়, তাহলে তো বরফের টুকরোটার ওপরেই আছে। ঝুঁকি নিতে গিয়ে বিমানটা ধ্বংস হলে তার কোন উপকার হবে না, বরং সবার ক্ষতি।

যাওয়ার সপক্ষে পাল্টা যুক্তি দিতে না পেরে চুপ হয়ে গেল ওমর। সিগারেট ধরিয়ে প্লেনের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। শুধু যে সাদা আলো আর না দেখার সমস্যা, তাই নয়, সমস্যা আরও আছে। কিশোর যদি বেঁচেও থাকে, তাকে উদ্ধার করবে কি ভাবে? ছোট বরফখণ্ডের ওপর বিমান নামাতে পারবে না। রবারের ভেলাটা ব্যবহার করতে হবে সেক্ষেত্রে। বরফের এত সব সচল টুকরোর ভেতর দিয়ে স্রোতের বিপরীতে সামান্য একটা রবারের ভেলা বেয়ে আনা সোজা কথা নয়, তার ওপর যখন ঠিকমত দৃষ্টিগোচর না হবার ব্যাপারটা রয়েছে। মুসাদেরও মেসেজ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ওরা এসে বিমানটা না দেখলে চিন্তায় পড়ে যাবে। উল্টোপাল্টা কিছু করে বসলে ঝামেলা বাড়বে। অপেক্ষা

করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখল না ওমর।

সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে বরফের টুকরো। একটা টুকরোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে উঠল ও। 'বিশেষজ্ঞরা ঠিকই বলেছেন, সামান্য উত্তরে সরে গিয়ে পুবমুখো বয়ে যায় স্রোত। তারমানে আমরা প্রথম যেখানে ক্যাম্প করেছিলাম, সেদিকে যাচ্ছে। কিশোর যে টুকরোটাতে রয়েছে, গলে না গেলে সেটা গিয়ে ঠেকবে গ্র্যাহাম পেনিনসুলায়।'

'আমারও তাই ধারণা,' মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। 'স্রোত যেদিকে বইবে, ওতে ভাসমান সব কিছুই সেদিকে যাবে। বরফ গেলে, তাতে আটকে থাকা জিনিসও যাবে। বরফখণ্ডে আটকে থেকে বড় বড় পাথরও ভেসে যেতে দেখেছি আমি।'

'খোঁজার সময় মাথায় রাখতে হবে কথাটা,' ওপর দিকে তাকাল ওমর। 'কি ব্যাপার, মেঘ কি পরিষ্কার হচ্ছে নাকি?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। ওপরে উঠছে।' চারপাশে তাকাতে লাগলেন ক্যাম্পবেল। 'কিন্তু আমার অবাক লাগছে, জেনসেন গেল কোথায়? কোনখানে গিয়ে লুকাল?'

'আছে হয়তো কোন বরফের স্তূপের আড়ালে,' জবাব দিল ওমর, 'লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের দেখছে এখন। সোনার নেশা মানুষকে যে কি করে তোলে, দেখেছি আমি; জেনসেনের মাথা খারাপ হলেও ওকে বিশ্বাস নেই,কখন কি করে বসে। সতর্ক থাকতে হবে আমাদের। সময় যখন পেয়েছি, সামান্য নাস্তা আর এক কাপ চা খেয়ে নেয়া যেতে পারে। ততক্ষণে আকাশ আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। রবিন, চা বসাও।'

আধঘণ্টা পর বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল আকাশ। আরও হচ্ছে। থার্মোমিটারে নেমে যাচ্ছে তাপমাত্রা। দেখতে দেখতে ক্যাপ্টেন

বললেন, 'রাতে ভাল বরফ জমবে আজ।'

'যত খুশি পড়ুকগে,' ওমর বলল। 'আমরা ঠিকমত সব দেখতে পেলেই হলো। রবিন, তুমি থাকো এখানে। আগুনটা উস্কে রেখো।' বিমানের দিকে এগিয়ে গেল সে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে তাকাল। স্থির হয়ে গেল। দূরে কোন কিছু চোখে পড়েছে তার। হাত নেড়ে ডাকল, 'ক্যাপ্টেন, এদিকে আসুন তো। আমি যা দেখছি, আপনিও কি দেখছেন?'

দেখতে দেখতে মাথা ঝাঁকালেন ক্যাম্পবেল, 'হ্যাঁ, বলা যায় আপনার চেয়ে বেশি দেখছি আমি, কারণ জাহাজটা আমার চেনা। ওটাই বেত্রাঘাই। তারমানে হাজির হয়ে গেছে পোত্রাঘাই।'

'সে-রকমই তো লাগছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে চোয়ালে হাত বোলাল ওমর। 'আমাদের প্ল্যানের পরিবর্তন করতে হতে পারে এখন।'

'কি করবেন?' কণ্ঠের উদ্বেগ চাপা দিতে পারলেন না ক্যাম্পবেল।

'কিছুই না।'

'সাবধান, ওরা কিন্তু ভয়ঙ্কর লোক।'

'ভয়ঙ্কর লোকের সঙ্গে আগেও সাক্ষাৎ হয়েছে আমার।'

'কিছু করা উচিত আমাদের,' জোর দিয়ে বললেন ক্যাম্পবেল। 'যদি মনে করে থাকেন, ওদের সঙ্গে বন্ধু হয়ে গিয়ে এক তাঁবুর নিচে বাস করব আমরা, ভুল করছেন। একপাল নেকড়ের সঙ্গে বাস করা বরং নিরাপদ, পোত্রাঘাইয়ের দলের চেয়ে। পোত্রাঘাই খারাপ লোক, খুব খারাপ।'

'কি করতে বলেন? পালাব?'

'না, তা বলছি না...'

'তাহলে চুপ করে থাকুন। এখানেই থাকব আমরা। দেখিই না, ওরা এসে কি বলে। যদি গোলমাল করে, আমরাও ছাড়ব না।'

'কিন্তু ওরা দলে অনেক ভারী, কি করব? যদি আগের দলটাকেই নিয়ে এসে থাকে পোত্রাঘাই, শঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে আমাদের।'

'ও ধরনের লোকের সঙ্গে পরিচয় আছে আমার,' সামান্যতম কাঁপল না ওমরের কণ্ঠ। 'কিছুই করতে পারবে না। পোত্রাঘাইকে এখানে নামতে বাধা দেব না আমরা, দিতে পারবও না। সেটা বেআইনী হবে। এ জায়গায় আমাদের যেমন অধিকার, তারও ততখানিই অধিকার। ও যদি গিয়ে আদালতে নালিশ করে, আমরাই বেকায়দায় পড়ব। ওর প্রথম চিন্তা হবে এখন, সোনাগুলো খুঁজে পাওয়া। না পেলে তখন হয়তো মুখোশ খুলবে। খোলার আগে পর্যন্ত তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করব, ওর জাহাজটাকে ব্যবহার করে কিশোরকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখব। যা অঞ্চল, এ ধরনের কাজে প্লেনের চেয়ে জাহাজ অনেক ভাল, এমনকি বেত্রাঘাইয়ের মত নড়বড়ে জাহাজও।'

'ব্যাটার সাহসের তারিফ করতে হয়।'

'কোনদিক থেকে?'

'এই যে, বরফের তোয়াক্কা না করে চলে আসছে। ঢুকেছে সহজেই, কিন্তু বেরোনোটা সহজ না-ও হতে পারে। দুটো বরফখণ্ডের মধ্যে চাপা পড়লে আমাদের পেছনের ওই জাহাজটার মতই অবস্থা হবে ওরটারও।'

'সোনার জন্যে যে কোন ঝুঁকি নিতে রাজি থাকে মানুষ।'

'তারপরেও আমি বলব, মস্ত ঝুঁকি নিয়েছে ও। আমি হলে সাবধান থাকতাম।'

anmsumon@yahoo.com www.murchona.com

'কোথায় আর থাকলেন?' হাসল ওমর। 'আমরা কি কম ঝুঁকি নিয়েছি? অতি সাধারণ একটা বিমানে করে মেরুসাগর পাড়ি দিয়ে কুমেরুতে যেভাবে ঢুকেছি, সেটাকে কি কেউ মগজের সুস্থতার লক্ষণ বলবে?'

'অ্যাঁ...' জবাব খুঁজে না পেয়ে ক্যাপ্টেনও হেসে ফেললেন।

বরফের মাঝখান দিয়ে পথ করে করে অতি সাবধানে এগিয়ে আসতে লাগল বেত্রাঘাই। বিমানটাকে দেখতে পেয়েছে, তাই ডেকে এসে জটলা করছে নাবিকেরা। আরও কাছে এলে ওদের উদ্দেশে হাত তুলল ওমর।

সোজা এগিয়ে এল জাহাজটা। এখানে ডাঙা নেই যে নিচে পানির গভীরতা কমে যাবে, মাটিতে ঠেকবে তলা। বরফের কিনারে এসে থামল ওটা। দড়িতে বাঁধা টায়ার আর দড়ির মোটা মোটা বান্ডিল নামিয়ে দেয়া হলো, যাতে খোলটা বরফের সঙ্গে ঘষা না খায়।

'ওই যে পোত্রাঘাই, মাথায় পীকড্ ক্যাপ পরা লোকটা,' নিচুস্বরে ওমরকে বললেন ক্যাম্পবেল। 'আর বাকি যে দুটোর কথা বলেছিলাম–মুসার ঘেউ আর বোকা, ওর পাশে দাঁড়ানো দুজন। ওরা কথা বলে কম, তবে অকাজ কম করে না। এই অভিযানে খরচের বেশির ভাগটা ওরাই জোগাচ্ছে, কোন সন্দেহ নেই আমার।'

'পোত্রাঘাইকেও বোকা ভাবার কোন কারণ নেই,' বিড়বিড় করে বলল ওমর। 'জায়গা চিনে ঠিক চলে এসেছে...'

কথা বন্ধ হয়ে গেল ওমরের। ডেকে বেরিয়ে আসা আরেকজনের ওপর স্থির হয়ে গেছে দৃষ্টি। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। 'পেয়ে গেছে ওকে, আরি!'

'কে?'

'কিশোর। ওই যে, দেখছেন না। পথে তুলে নিয়েছে। এখন বুঝলাম, এত সরাসরি কি করে আসতে পারল ওরা। কিশোর বলেছে। আর কি কি বলেছে খোদাই জানে।'

'সোনার কথা নিশ্চয় বলেনি। তাহলে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট উড়তে শুরু করত এতক্ষণে।'

'সোনার কথা কিছু বলবে না ও, এত বোকা নয়।'

'তাহলে ওরা নিজেরাই সোনাগুলো পেয়ে গেছে। কিশোর তো ওগুলোর ওপরই বসে ছিল।'

'তা-ও নয়। সোনাগুলো পায়নি এখনও পোত্রাঘাই।'

'কি করে বুঝলেন?'

'এ তো সহজ কথা। সোনা পেলে এখানে আসতে যেত নাকি সে? কি ঠেকা পড়েছে। সোজা নাক ঘুরিয়ে উত্তরে রওনা হয়ে যেত। কিশোর বেশি বাড়াবাড়ি করলে মাথায় একটা বাড়ি মেরে পানিতে ফেলে দিত, যেত ল্যাঠা চুকে। ওকে নামিয়ে দিতে আসার মত মহাপুরুষ কি পোত্রাঘাই, আপনার কি মনে হয়?'

হাসলেন ক্যাম্পবেল, 'হুঁ, তা বটে।'

দু'পাশে দুই জাপানীকে নিয়ে এগিয়ে এল পোত্রাঘাই। মুখে মাফলার জড়ানো থাকাতে ক্যাম্পবেলকে এখনও চিনতে পারেনি। ওমরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার এক সহকারীকে নিয়ে এলাম।'

'দেখতেই তো পাচ্ছি,' ভদ্রস্বরে জবাব দিল ওমর। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। চিন্তায়ই পড়ে গিয়েছিলাম।'

'ও আমাকে বলল আমেরিকান সরকারের পক্ষ থেকে এখানে একটা অভিযানে এসেছেন আপনারা।'

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

মৃদু হাসল ওমর। 'ঠিকই বলেছে। সরকারের তরফ থেকেই এসেছি।'

ক্যাম্পবেলের ওপর চোখ পড়ল পোত্রাঘাইয়ের। চিনে ফেলল। তাতেই যা বোঝার বুঝে গেল সে। বদলে গেল কণ্ঠস্বর, 'ও, তুমিও এসেছ!'

'তাতে কি কোন অসুবিধে আছে আপনার?' মাফলার দিয়ে নিজেকে গোপন রাখার চেষ্টা করলেন না আর ক্যাম্পবেল।

মাথা ঝাঁকাল পোত্রাঘাই। 'এতক্ষণে বুঝলাম অভিযানটা কিসের। অহেতুক আর কথা বাড়ানোর কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। জাহাজটা কোথায়?'

হাত তুলে দেখালেন ক্যাম্পবেল, 'ওই যে। আগের বার যে রকম দেখে গিয়েছিলে, তারচেয়ে অবস্থা খারাপ হয়েছে বোধহয়। মাস্তুল ভেঙে পড়েছে, বরফ জমেছে আরও, তাই না?'

জাহাজটার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল পোত্রাঘাই, 'সোনাগুলো ভেতরেই আছে?'

'না।'

চোখের পাতা সরু হয়ে এল পোত্রাঘাইয়ের, 'কি করে বুঝল?'

'গিয়ে নিজের চোখেই দেখে এসো।'

'তাহলে কোথায় ওগুলো?'

ক্যাম্পবেল কিছু বলার আগেই তাড়াতাড়ি জবাব দিল ওমর, 'সেটাই তো জানার চেষ্টা করছি।'

'আপনি বলতে চাইছেন, পাননি ওগুলো?'

'পেলে কি এখনও বসে থাকতাম?'

'ভাঁওতা দিচ্ছেন না তো?' পোত্রাঘাইয়ের চোখে সন্দেহের কালো ছায়া।

একটা কাঁধ উঁচু করে ঝাঁকি দিল ওমর। 'জাহাজটাও আছে, আমার প্লেনটাও এখানেই, কোনটাতেই সোনাগুলো পাবেন না। যান, দেখার অনুমতি দিচ্ছি।'

'অনুমতি!' কঠিন হয়ে গেল পোত্রাঘাইয়ের কণ্ঠ। 'আপনি অনুমতি দেবার কে? এখানে আমার যা খুশি আমি করতে পারি।'

'তর্কের মধ্যে যাচ্ছি না আমি,' শান্তকণ্ঠে বলল ওমর। 'তবে আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, স্যালভেজ অপারেশনে এসেছি আমি, আর এটাতে সহযোগিতা করছে আমেরিকান সরকার। সরকারী নির্দেশে এসেছি আমি, প্লেন থেকে শুরু করে সমস্ত যন্ত্রপাতি, খরচ, সব দিচ্ছে সরকার। এর কোনটার কোন ক্ষতি হলে আপনি যে দেশের লোকই হোন না কেন আন্তর্জাতিক আদালতের সামনে হাজির হতেই হবে। সুতরাং সাবধান।'

ওমরের পাশে দাঁড়ানো কিশোরের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল পোত্রাঘাই। 'তোমার কথার সঙ্গে কিন্তু মিলছে না।'

'কোন্ কথাটা মিলছে না? যা যা জিজ্ঞেস করেছেন, সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছি আমি। কোন্‌টা ভুল, বলুন?'

চিন্তা করল পোত্রাঘাই। কোন্‌টা ভুল, বের করতে না পেরে চুপ হয়ে গেল। কিন্তু চেহারার ক্রুর ভঙ্গিটা দূর হলো না। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে বসাল। আগুন ধরিয়ে ম্যাচের কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। ভুরু নাচাল ওমরের দিকে চেয়ে, 'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন সোনাগুলো নেই?'

'নিজের চোখে দেখে আসতেই তো বলছি। তবে আমার পরামর্শ চাইলে বলব, দেখতে গিয়ে দেরি না করে সোজা নিজের জাহাজে উঠে সময় থাকতে থাকতে কেটে পড়ুন। বরফ এসে চেপে ধরলে আর দেশে ফেরা লাগবে না, ওই জাহাজটার অবস্থা

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

হবে,' পেছনের ধ্বংসাবশেষটার দিকে আঙুল তুলল ওমর।

'আমি বাড়ি যাব? কিছুই না নিয়ে? কি যে বলেন।'

'সেটা আপনার ইচ্ছে। আর কথা বলার সময় নেই আমার। জরুরী কাজ আছে।'

'শুনুন, সোনাগুলো ভাগাভাগি করে নিতে পারি আমরা। আপনি চাইলে কিছুটা ছাড় দিতে পারি।'

'ছাড় কে চাইছে আপনার কাছে? আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি নই। রাজি হওয়া সম্ভব নয়। ওই সোনার মালিক এখন আমেরিকান সরকার, আগেই বলেছি আপনাকে,' শীতল কণ্ঠে বলল ওমর। 'তা ছাড়া সোনা ওখানে থাকলে তো ভাগাভাগি করব।'

'ওই জাহাজটাতে নেই?'

'না।'

'তাহলে জেনসেন লুকিয়ে ফেলেছে কোথাও। এই ছেলেটা বলল,' কিশোরকে দেখাল পোত্রাঘাই, 'জেনসেন নাকি ওই ভাঙা জাহাজেই থাকে।'

'হ্যাঁ,' ওমর বলল। 'কুড়াল ছুঁড়ে আমার মাথা ফাঁক করে দিতে চেয়েছিল। তারপর দৌড়ে পালাল। বদ্ধ উন্মাদ। ওর ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন।'

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল পোত্রাঘাই। 'ও-নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।'

'ভাবতে যাচ্ছিও না আমি। সাবধান করা প্রয়োজন, তাই করলাম। ওই লোক যা খুশি ঘটিয়ে বসতে পারে। তবে এ-ও বলে দিচ্ছি, পাগল ঠেকানোর ছুতোয় যে কাউকে খুন করবেন, তা-ও চলবে না। খুনের চেষ্টা তাকে একবার করেছেন আপনি,

শুনেছি। এখানে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন মরার জন্যে। ওর পাগল হওয়ার জন্যে আপনিই দায়ী। সুতরাং এখন ভাল করার দায়িত্বও আপনার, নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দেয়ার।'

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়ল পোত্রাঘাই। 'কি ব্যবস্থা করতে হবে ভালই জানা আছে আমার, ওকে আগে পেয়ে তো নিই। এখন জাহাজটা দেখে আসি। অনুমতি তো পাওয়াই গেল, কি বলেন?'

ব্যঙ্গটা গায়ে মাখল না ওমর। 'হ্যাঁ, যান। তবে কোন জিনিস সরানোর অনুমতি দেয়া যাচ্ছে না।'

দু'পাশে দাঁড়ানো দুই সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করল পোত্রাঘাই। 'চলুন।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে ভাঙা জাহাজটার কাছে চলে গেল ওরা। বরফের সিঁড়ি বেয়ে উঠে নেমে গেল কম্প্যানিয়ন-ওয়েতে।

ওরা অদৃশ্য হয়ে গেলে আনমনে বিড়বিড় করল ওমর, 'জটিল হয়ে গেল পরিস্থিতি।' তারপর তাকাল কিশোরের দিকে, 'কি হয়েছিল তোমার?'

যা যা ঘটেছে সংক্ষেপে জানাল কিশোর।

'সোনাগুলো তাহলে বরফের মধ্যেই আছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল ওমর। 'আমরা তো ভেবেছিলাম সাগরেই পড়ে গেছে।'

'না, পড়েনি।'

'তোমাকে যখন তুলে নেয়া হলো, বরফখণ্ডটা কোনদিকে ভেসে যাচ্ছিল, বলতে পারবে?'

'পুবদিকে, কিছুটা উত্তর ঘেঁষে।'

'বরফখণ্ডটা কত বড় হবে?'

'বেশ বড়, তিন একরের কম না।'

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

'দেখতে কেমন?'

'একমাথা সরু, আরেক মাথা চওড়া। তবে ত্রিকোণ নয়, অনেকটা নাশপাতির মত।'

'প্লেন নামানো যাবে না?'

'না।'

'আবার দেখলে চিনতে পারবে?'

'পারব, যদি ওটার মত আরও না থেকে থাকে, কিংবা গলে আকৃতি অন্য রকম হয়ে না যায়। তবে কাছে থেকে দেখলে আকৃতি নষ্ট হলেও চিনব, সোনার স্তূপের ওপর কাঠের ফালি পুঁতে চিহ্ন দিয়ে রেখেছি। তুষারে ঢেকে গেছে বলে সোনাগুলো দেখতে পায়নি পোত্রাঘাই।'

জাহাজের খোল থেকে বেরিয়ে এল পোত্রাঘাই আর তার দুই সঙ্গী। ওমরদের কাছে এসে দাঁড়াল। 'না, নেই, আপনি ঠিকই বলেছেন। আগের বার আমরা দেখে যাওয়ার পর কেউ জাহাজে উঠেছে, সরিয়ে ফেলেছে ওগুলো। মানুষ বাস করার চিহ্নও দেখে এলাম। খাবারের টিন খোলা, টেবিলে বাসন-পেয়ালা পড়ে আছে...'

'সে তো আপনাকে আমি বললামই।'

'তা বলেছেন, নিজের চোখে দেখে শিওর হয়ে নিলাম, ভাল হলো না?' বিমানটার দিকে তাকাল পোত্রাঘাই, 'ওটার মধ্যে নেই তো?'

'এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'এত টাকার সোনা, কি করে হবে বলুন?'

'আমি বলছি, নেই। তারপরেও যদি সন্দেহ না যায় আপনার, উঠে দেখতে পারেন, বাধা দেব না।'

বিমানের কেবিনটা দেখে এল পোত্রাঘাই।

'কি, আছে?' জিজ্ঞেস করল ওমর।

জবাব দিল না পোত্রাঘাই। দুই সঙ্গীকে বলল, 'চলুন, জাহাজে চলুন।'

বেত্রাঘাইয়ের দিকে এগোল তিনজনে।

নিচুস্বরে সঙ্গীদের বলল ওমর, 'চলো, আমাদের আলোচনাটাও সেরে ফেলি। প্লেনে বসে সারাটাই নিরাপদ।'

নয়

'দেখলে তো!' ওমর বলল। 'বলেছিলাম না, আমার জানামতে কোন স্যালভেজ অপারেশন নিরাপদে ঘটেনি। এবারও নিরাপদে সারা যাবে না। নইলে দেখো না, বরফের টুকরোটা ভাঙার যেন আর সময় পেল না। গতকালও ভাঙতে পারত, কিংবা আগামীকাল। ওটা ভেঙে ভেসে গেল, আর ঠিক সেই সময় যেন কিশোরকে উদ্ধার করে জট পাকানোর জন্যেই এসে হাজির হলো পোত্রাঘাই—আগেও না, পরেও না। দেখেশুনে মনে হয় আড়ালে বসে অদৃশ্য কেউ আমাদের নিয়ে খেলছে আর মুচকি মুচকি হাসছে...যাকগে, এরপর কি?'

'কি আর, সোনাগুলো খুঁজে বের করা,' কিশোর বলল।

'কিন্তু পোত্রাঘাইয়ের অলক্ষে করব কি ভাবে? এত সহজে হাল

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

ছাড়বে না ও।'

'আমাদের কাছে তো সোনাগুলো নেই দেখলই, কি করবে বলে মনে হয় আপনার?'

সামান্য চিন্তা করে নিল ওমর। 'ও জানে, সোনাগুলো কাছাকাছিই আছে। তন্নতন্ন করে খুঁজবে। আমরা সরিয়েছি, এটা অবশ্য ভাবছে না এখনও। সন্দেহ করছে জেনসেনকে। পোত্রাঘাইয়ের জায়গায় আমরা হলে আমরাও একই সন্দেহ করতাম। জেনসেন একা এতগুলো ভারী সোনার বার বেশিদূরে সরাতে পারবে না, তাই জাহাজটার কাছাকাছিই আছে ধরে নিতাম। কিংবা জাহাজের ভেতরে কোথাও। সেক্ষেত্রে দরকার হলে জাহাজটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করতাম। করিনি দেখে অবাক হবে পোত্রাঘাই। ভাবতে ভাবতে হয়তো বেরও করে ফেলতে পারে আসল সত্যটা। তবে ওসব করার আগে জেনসেনকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে সে।'

'জেনসেন ওকে কিছু জানাতে পারবে না,' ক্যাম্পবেল বললেন। 'সে পাগল। পাগলামি করবে, উল্টোপাল্টা কথা বলবে। কোন উপকারে আসবে না পোত্রাঘাইয়ের।'

'আমাদের ওপর নজর রাখবে পোত্রাঘাই,' কিশোর বলল।

'তা তো রাখবেই,' মাথা ঝাঁকাল ওমর। 'সেজন্যেই তার নজরের আওতায় থাকতে চাই না আমি। পুরানো ক্যাম্পে ফিরে যাব। তাঁবুটা খাটানো আছে এখনও, ওজন কমানোর জন্যে খাবার আর অন্যান্য জিনিস বেশির ভাগই ফেলে এসেছি। আরও একটা কারণে ওখানে যেতে চাই, জায়গাটা পুবে, আর তুমি বলছ বরফখণ্ডটা ভেসে যাচ্ছে সেদিকেই।'

'কিন্তু সোনাগুলো পাওয়া গেলেও তুলে আনব কি করে?'

রবিনের প্রশ্ন।

তার দিকে তাকাল ওমর, 'অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে সেটা। আদৌ পারব কিনা সেটাও প্রশ্ন। এমন হতে পারে মূল বরফখণ্ডের দিকে না গিয়ে সোজা খোলা সাগরের দিকে ভেসে গেল। কোনভাবেই তুলে আনতে পারব না আর তখন। প্লেন নামানো না গেলে নামব কি করে? খোলা সাগরে গেলে গরম বাতাসের সংস্পর্শে এসে গলতে শুরু করবে বরফ। টুপ টুপ করে পানিতে পড়ে যাবে বারগুলো। হারিয়ে যাবে চিরকালের জন্যে।'

'এখনই কিছু একটা করা দরকার,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন ক্যাম্পবেল। 'মুসাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন তো?'

'তা তো করতেই হবে, খবর যখন পাঠিয়ে দিয়েছি। তবে এখানে নয়। পুরানো ক্যাম্পে গিয়ে। কোথায় নামতে হবে ধোঁয়া জ্বেলে সঙ্কেত দেব ওদের। এখানে আর দেরি করার কোন কারণ দেখি না। আর আধঘন্টার মধ্যেই চলে আসবে মুসারা। যাওয়া যাক।'

'আমাদের যেতে দেখলে পোত্রাঘাই কি করবে?'

'যা ইচ্ছে করুক। আমাদের যেতে দেখলে বরং খুশিই হবে, নিরাপদে সোনা খুঁজতে পারবে ভেবে।'

বিমানের ইঞ্জিন গর্জে উঠতেই ডেকে দাঁড়ানো পোত্রাঘাই আর তার নাবিকের দল রেলিঙের কিনারে এসে দাঁড়াল। সব ক'টা চোখের নজর এদিকে। কিন্তু কিছুই করল না ওরা। চুপচাপ তাকিয়ে রইল।

আকাশ আরও পরিষ্কার হয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুরানো ক্যাম্পটা নজরে এল। সেদিকে চলল ওমর। কিশোর পাশে বসে আছে। রবিন আর ক্যাম্পবেল আগের মতই পেছনে।

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

রেডিওতে মুসাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে রবিন। জানা গেল, কাছে চলে এসেছে ওরা।

ওমর বিমান নামাতেই দরজা খুলে নেমে গেল কিশোর আর রবিন। প্যাকিং বাক্সের কাঠ আর মলাট দিয়ে আগুন জ্বেলে ধোঁয়া করল মুসাদের সঙ্কেত দেবার জন্যে।

দশ মিনিট পরেই এসে হাজির হলো ওরা। ধোঁয়ার ওপর চক্কর মারল বার দুই। তারপর নেমে এল। নিরাপদেই নামল। কোন বিপদ ঘটল না। দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে ছুটে আসতে গেল মুসা। বরফের গুঁড়োয় পা ডেবে গিয়ে গতি কমে গেল। অবাক চোখে তাকাতে লাগল নিচের দিকে।

'খাইছে!' কাছে এসে ওমরের দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'এরমধ্যে এতদিন হেঁটেছেন কি করে?'

'এসেছ, জিরাও। শান্ত হয়ে বসে এক কাপ চা খাও। সব বলছি। তবে আগেই একটা ভয় ধরিয়ে রাখি, দুটো প্লেনই এখন এখানে। কোন কারণে যদি উড়ানো না যায়, আটকা পড়ি, মরতে হবে। কেউ উদ্ধার করতে আসবে না আমাদের।'

'তাহলে আনালেন কেন?' রোজার বলল।

'প্রয়োজন আছে বলেই আনিয়েছি।'

'মাইল দুয়েক দূরে একটা জাহাজ দেখে এলাম,' মুসা বলল। 'কার ওটা?'

হাসল ওমর। 'বললামই তো শান্ত হয়ে বোসো, বলছি সব। যে ভাবে প্রশ্ন শুরু করলে দুজনে, কোনটা ছেড়ে কোনটার জবাব দেব?'

চায়ের পানি চড়িয়েই রাখা হয়েছিল। গরম বাষ্প উঠতে থাকা মগে চুমুক দিতে দিতে সোনা উদ্ধারের কাহিনী খুলে বলল ওমর।

কি করে সেগুলো আবার হাতছাড়া হয়ে গেছে, তা-ও জানাল। সবশেষে বলল, 'এই হলো বর্তমান পরিস্থিতি। কোন বুদ্ধি বেরোলে বলতে পারো।'

ঘন ঘন কয়েকবার চুমুক দিল মুসা, 'আমার কোন বুদ্ধি নেই।'

'তাহলে সোনাগুলো ফেলেই চলে যেতে বলছ?'

'না, আপনি আর কিশোর থাকতে কোন বুদ্ধি বেরোবে না এটা আমি বিশ্বাস করি না। কি ভাবে উদ্ধার করবেন আপনারা জানেন। আমার সহজ কথাটা বলে দিই, এত কষ্ট করে এতদূর এসে ওই সোনা ফেলে আমি যাচ্ছি না। এক টন সোনা হরহামেশা মেলে না।'

শব্দ করে হাসল ওমর। 'উদ্ধার করতে গিয়ে তখন অন্য কথা বলবে। তোমরা বসো, আমি আর কিশোর গিয়ে দেখে আসি বরফখণ্ডটার অবস্থা।'

'আমার কি কিছু করার আছে?' জানতে চাইলেন ক্যাম্পবেল।

'আছে। আপনি আর রোজার পালা করে পাহারা দেবেন, নজর রাখবেন শত্রুশিবিরের ওপর। আপাতত কিছু করবে বলে মনে হয় না ওরা, তবু শত্রুকে বিশ্বাস নেই।' দু'শো গজ দূরে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে বরফ, সেটা দেখিয়ে বলল ওমর, 'ওটার মাথায় চড়ে বসলে জাহাজটা চোখে পড়বে সহজেই।'

ঘাড় কাত করলেন ক্যাপ্টেন, 'ঠিক আছে।'

আকাশের দিকে তাকাল ওমর। এত দ্রুত এতটা পরিষ্কার হবে, কল্পনাই করেনি। যে ভাবে তুষারপাত শুরু হয়েছিল, আদৌ বন্ধ হবে কিনা, সেটা নিয়েই ছিল দুশ্চিন্তা। আর এখন যে হারে সাফ হচ্ছে, কিছুক্ষণের মধ্যে ঝকঝকে হয়ে যাবে আকাশ, দিগন্তে

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

সূর্য দেখা দিলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। এর নাম কুমেরু। কখন যে কি ঘটবে এখানে, কেউ বলতে পারে না। তুষারপাতের সময় দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল মাত্র কয়েক গজ, তা-ও অস্পষ্ট; তারপর কয়েকশো গজ, এখন কয়েক মাইল দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে। জিনিস বলতে শুধুই বরফ–বরফের টুকরো, বরফের স্তূপ, বরফের টিলা, বরফের পাহাড়। একঘেয়ে দৃশ্য, কোন বৈচিত্র্য নেই।

আকাশে উড়ে কিছুদূর এগোতে না এগোতেই নিচের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'ওই যে টুকরোটা! ওটাই!'

'তুমি শিওর?'

'হ্যাঁ।'

গতি যতটা সম্ভব কমিয়ে সেদিকে উড়ে গেল ওমর। নাশপাতি আকারের টুকরোটার আশেপাশে ছোটবড় অনেকগুলো টুকরো ভাসছে। একই দিকে এগিয়ে চলেছে সবগুলো। তবে এতই ধীরে, চট করে বোঝার উপায় নেই।

কাছাকাছি এসে নিচে নামাল ওমর। কিশোরকে বলল, 'দেখো, তোমার চিহ্নটা চোখে পড়ে কিনা।'

'আরেকটু নামান।'

নামাল ওমর। এর বেশি আর নামানো সম্ভব না। চক্কর দিতে লাগল খণ্ডটার ওপর।

হঠাৎ আবার চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি! ওই যে, কাঠের টুকরোটা! যে ভাবে গেঁথেছিলাম সেভাবেই আছে!'

হাসি ফুটল ওমরের মুখে, 'ফাইন। একটা সমস্যা গেল। খুঁজে বের করাতে কোন ঝামেলা হলো না। এখন বোঝার চেষ্টা করো

তো, কোনদিকে ভেসে যাচ্ছে।'

মিনিট দুয়েক টুকরোটার ওপর থেকে চোখ সরাল না কিশোর। তারপর মাথা নাড়ল, 'নাহ্, ওপর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। আমরা সরছি অনেক দ্রুত। এ অবস্থায় বোঝা যাবেও না।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। পাওয়া যখন গেল, ক্যাম্পে ফিরে যাই বরং, ওখান থেকে নজর রাখব।'

বিমান নামতেই বরফের গুঁড়োর ওপর দিয়ে যতটা দ্রুত পারা গেল দৌড়ে এল মুসা। কিশোরকে দরজা খুলে নামতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার? এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে? আমরা তো ভাবলাম অনেক সময় লাগবে।'

'ঠিকমত দেখতে পারা গেলে অনেক কিছুই খুব সহজ হয়ে যায়। ওপরে উঠেই দেখি টুকরোটা, এদিকেই আসছে। আকাশ এ রকম পরিষ্কার থাকলে, আর পোত্রাঘাই এসে নাক না গলালে বাকি কাজটা সারতেও খুব একটা কষ্ট হবে না।'

রবিনও এসে দাঁড়িয়েছে মুসার পেছনে। 'কি করতে চাও?'

'আপাতত কিছুই না। শুধু বরফখণ্ডটার ওপর নজর রাখব। কোন দিকে যায় ওটা, দেখব। কোন দিকে যাবে, সেটার ওপরই নির্ভর করছে এখন সবকিছু।'

'অত নির্ভরতার মধ্যে না গিয়ে রবারের ভেলাটায় করে গিয়ে নিয়ে আসা যায় না?' মুসার প্রশ্ন।

'বারগুলো তো আর হাতে নিয়ে দেখনি, তাই বলছ,' ওমরও নেমে এসেছে। 'যা ভারীর ভারী, ভেলার মধ্যে একটার বেশি তোলাই যাবে না। মাইলখানেক দূরে রয়েছে এখনও খণ্ডটা। অতদূর ভেলা বেয়ে নিয়ে গিয়ে সোনার বার তুলে আবার ফিরে আসা, একবার যাতায়াত করলেই বুঝবে ঠেলা। তা-ও যদি ভাগ্য

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

অতিরিক্ত ভাল হয়, বরফের খোঁচা থেকে বাঁচাতে পারো ভেলাটাকে, তাহলে ফিরে আসতে পারবে। একবার গিয়ে ফিরে এলে দ্বিতীয়বার আর ওমুখো হতে চাইবে না।'

'তারমানে সম্ভব না বলতে চাইছেন?'

'না, সম্ভব না। তবে কুমেরুর পানিতে সাঁতার কাটতে গিয়ে জমে মরার যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে, আমার আপত্তি নেই। তারচেয়ে অন্য প্রস্তাব দিচ্ছি, ভেবে দেখো। তাঁবুতে বসে গরম গরম কিছু খেয়ে নেয়া যাক। সাঁতার এবং খাবারের মধ্যে কোনটা বেশি লোভনীয়, তোমারটা তুমিই বিবেচনা করো।'

দশ

খেয়ে আর কথা বলে আধঘণ্টা পার করে দিল ওরা। ইতিমধ্যে আরও কাছে চলে এসেছে বরফখণ্ডটা। ক্রমাগত কানে আসছে ভাসমান বরফের পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ভাঙার গর্জন, কড়মড় শব্দ।

'পোত্রাঘাইটা হয় একটা গাধা, নয়তো সোনার লোভে অন্ধ হয়ে গেছে,' ভাসমান বরফখণ্ডগুলোকে দেখতে দেখতে বললেন ক্যাম্পবেল। 'বাতাসটা যে ভাবে বইছে, দুই-এক ডিগ্রি সরলেই আটকা পড়বে ও। জাহাজ নিয়ে বেরোনোর আশা শেষ।'

'সেটা না হলেই ভাল,' হালকা গলায় বলল ওমর। 'তাহলে

স্লেজে করে ওকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাদের।'

সে নিজেও তাকিয়ে আছে খণ্ডগুলোর দিকে। ক্যাম্পবেলের মত অতটা না বুঝলেও এটুকু বুঝল, তাঁর কথা ঠিক।

ক্রমেই এগিয়ে আসছে সোনা ভর্তি বরফখণ্ডটা। বাতাস আর স্রোতের কারণে দ্রুত এগোচ্ছে এখন। তবে মূল বরফখণ্ডের গুহা যেখানে রয়েছে তার কাছে ঠেকবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না এখনও। অপেক্ষা করে দেখা ছাড়া উপায় নেই।

বরফের পাহাড়ে চড়ে পালা করে পাহারা দিচ্ছেন ক্যাম্পবেল আর রোজার। পোত্রাঘাইয়ের গতিবিধির ওপর নজর রাখছেন। দূরবীনের সাহায্যে দেখা যাচ্ছে জাহাজটার আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছে লোকজন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সোনা খুঁজছে। হয়তো জেনসেনকেও খুঁজে বের করেছে।

খানিক পরে গুলির শব্দ শুনে ভুরু কোঁচকাল ওমর, 'কাকে গুলি করল?'

'ওদের আবার বাছবিচার আছে নাকি,' তিক্তকণ্ঠে জবাব দিলেন ক্যাম্পবেল। 'সীল, পাখি, যা সামনে পাবে, বিনা বিচারে গুলি চালাবে।'

'আপনার কথা সত্যি হলেই ভাল হয়,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বিড়বিড় করল ওমর।

বরফখণ্ডটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অধৈর্য হয়ে উঠেছে ওরা। স্নায়ুতে চাপ পড়ছে ভীষণ। পারলে হাত দিয়ে ধরে টেনে নিয়ে আসে ওটাকে। দূরবীন দিয়ে দেখছে কিশোর। বরফের মাঝখানে উঁচু হয়ে থাকা জায়গাটা দেখতে পাচ্ছে। গেঁথে রেখে আসা কাঠের ফলকটাও চোখে পড়ল।

একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে সিগারেট টানছে ওমর।

amnsumon@yahoo.com
www.murchona.com

বরফখণ্ডটা একশো গজ দূরে থাকতে উঠে দাঁড়াল সে। পোড়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'আর বেশি দেরি নেই,' বলল সে। 'প্রথমে মুসাদের প্লেনটা ভর্তি করব। রোজার ওটা নিয়ে চলে যাবে। মুসার যাওয়ার দরকার নেই। তাতে দুটো সুবিধে। এক, মুসার ওজনের সমান সোনা বেশি নিয়ে যেতে পারবে। আর দ্বিতীয়ত, মুসাকে এখানে আমরা কাজে লাগাতে পারব। এখন হোক, পরে হোক, পোত্রাঘাইয়ের সঙ্গে ঠোকর আমাদের লাগবেই। লোকবল বাড়িয়ে রাখা ভাল।'

রোজার বলল, 'আমার একা যেতে কোন অসুবিধে নেই।'

কাছে এসে গেল বরফখণ্ড। পাহাড়ের ওপরে পাহারা দিতে গেছে রোজার। বাকি সবাই তৈরি হলো সোনাগুলো তুলে আনার জন্যে। খুব ধীরে ঘুরতে ঘুরতে আসছে খণ্ডটা। মূল বরফখণ্ডের গায়ে ধাক্কা লেগে ঘুরপাক খাচ্ছে স্রোত, ঘুরছে তাতে ভাসমান বরফগুলোও। আস্তে করে এসে ধাক্কা খেল বরফখণ্ডটা, চওড়া অংশটা ঘুরে গিয়ে সরু দিকটা আটকে গেল মূল বরফখণ্ডের গায়ে। গর্জন, কড়মড়, চড়চড়, নানা রকম শব্দ তুলল। কয়েক গজ সরে গিয়ে আবার ধাক্কা খেল। আটকে গেল। আর সরল না।

সোনা আনতে যেতে তৈরি হচ্ছে ওরা, এই সময় দৌড়ে এল রোজার। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'পোত্রাঘাই আসছে। সঙ্গে ছয়জন লোক।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল ওমর, 'আমার আর সময় পেল না ব্যাটা। চুপ করে বসে থাকো সবাই। এখন সোনা আনতে গেলে দেখে ফেলবে। কোনমতেই দেখতে দেয়া চলবে না ওকে।'

আবার প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে পড়ে সিগারেট ধরাল সে। বাকি সবাই কেউ বা বসে, কেউ দাঁড়িয়ে রইল তাকে ঘিরে।

পাহাড় পেরিয়ে সদলবলে সোজা ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে এল পোত্রাঘাই। ওমরের সামনে এসে দাঁড়াল। ভয়ঙ্কর করে রেখেছে মুখ-চোখ। কোন ভূমিকার মধ্যে না গিয়ে কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'সোনাগুলো কোথায়?'

চেহারায় বিরক্তি ফুটিয়ে তুলল ওমর, 'আমি কি জানি?'

'মিথ্যে বলে আর লাভ নেই, মিস্টার ওমর। আপনি যে জানেন, সেটা আমরা জেনে ফেলেছি।'

একটা ভুরু উঁচু হলো ওমরের। 'ও। তাতেই বা এত উত্তেজিত হওয়ার কি আছে? সোনাগুলো তো আপনার নয়।'

'অবশ্যই আমার।'

'গায়ের জোরে? আপনার হলো কি করে?'

প্রশ্নটার জবাব দিতে না পেরে রেগে উঠল পোত্রাঘাই, 'আপনি বলেছেন আপনার কাছে নেই সোনাগুলো।'

'তা তো নেইই।'

'মিথ্যে কথা।'

মুখে কৃত্রিম বিষণ্ণ হাসি ফোটাল ওমর। 'আপনাকে চালাক মনে করেছিলাম, কিন্তু আপনি আসলেই বোকা লোক, পোত্রাঘাই। সোনাগুলো যদি পেয়েই থাকি বসে আছি কেন এখনও, বরফে সানবেদিং করার জন্যে?'

দ্বিধায় পড়ে গেল পোত্রাঘাই। কোন প্রশ্ন করেই সুবিধে করতে পারছে না। 'কি করেছেন ওগুলোকে?'

ভুরু কুঁচকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইল ওমর। 'আমার ক্যাম্পে এসে আমাকে এভাবে প্রশ্ন করার অধিকার কে দিল আপনাকে? আর কি করে ভাবলেন প্রশ্ন করলেই আমি জবাব দেব? শান্ত থাকার অনেক চেষ্টা করছি আমি, পোত্রাঘাই,

amimsumon@yahoo.com www.murchona.com ©

কিন্তু আপনি আমাকে ধৈর্যের শেষ সীমায় ঠেলে দিচ্ছেন। আমি সরকারী লোক। ওগুলো উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছে আমাকে সরকার। প্রশ্ন করার অধিকার এখানে কারও যদি থাকে, সেটা একমাত্র আমার আছে, আপনার মোটা মাথায় ঢুকছে না কেন কথাটা? আমি জানি আপনি কে, কেন এসেছেন। গতবার এসে কি কাণ্ড করে গেছেন, তা-ও জানি।'

ওমরের কথায় দমল না পোত্রাঘাই। 'আর আমি জানি সোনাগুলো আপনার কাছে আছে।'

কৌতূহলী হলো ওমর। 'এত শিওর হলেন কি করে?'

'জেনসেন বলেছে। সোনাগুলো সরাতে দেখেছে সে।'

'ও, তারমানে ওকে খুঁজে ঠিকই বের করেছেন।'

'আপনি কি ভেবেছিলেন?'

'লোকটা পাগল।'

'পাগল হলেও এতটা নয় যে সোনা সরাতে দেখতে পাবে না, আর সেটা বলতে পারবে না।'

'তারমানে আমি যখন দেখেছি, তখনকার চেয়ে পাগলামি কমেছে ওর,' বিড়বিড় করল ওমর।

'কমানোর ওষুধ দিয়েছি, তাতেই কমেছে।'

'তাই?' চোখের পাতা সরু হয়ে এল ওমরের। 'কি ওষুধ?'

'সেটা আপনার জানার দরকার নেই।'

'আছে, দরকার আছে,' হাসি হাসি ভাবটা চলে গেল ওমরের কণ্ঠ থেকে, কঠিন হয়ে উঠল। 'ওর এ অবস্থার জন্যে আপনিই দায়ী। ওকে ফেলে গেছেন বলেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর। দেশে নিয়ে যাওয়া এখন আপনার কর্তব্য; যদিও আপনার হাতে ছেড়ে দেয়ার চেয়ে আমি নিয়ে গেলেই বেশি নিরাপদ থাকবে ও।

কে নেবে ওকে, আপনি না আমি?'

'ওকে নিয়ে ভাবতে হবে না।'

'মানে!' সন্দেহ দেখা দিল ওমরের চোখে।

জবাব দিতে গিয়েও কি ভেবে দিল না পোত্রাঘাই। দেঁতো হাসি হাসল। বলল, 'ঠিক আছে, এতই যদি পরাণ কাঁদে, নিয়ে যাবেন আপনিই।'

'গুলির শব্দ শুনলাম। কিছু করেননি তো ওকে?'

'করলেই বা আপনার কি?'

'সাবধান হয়ে কথা বলুন, পোত্রাঘাই,' বরফের মত শীতল শোনাল ওমরের কণ্ঠ। 'এখানে অনেক লোককে সাক্ষী বানিয়ে ফেলেছেন আপনি। ওর কোন ক্ষতি হলে খেসারত দিতে হবে আপনাকে। যদি ভেবে থাকেন এই দুর্গম এলাকায় একআধটা খুন করে ফেলে রেখে গেলে কে আর দেখতে যাচ্ছে, তাহলে ভুল করবেন। কোনভাবেই পার পেতে দেব না আমি আপনাকে, মনে রাখবেন। এখন ঘাড় ধরে বের করে দেয়ার আগেই বিদেয় হোন আমার ক্যাম্প থেকে।'

দাঁতে দাঁত চাপল পোত্রাঘাই। ভঙ্গি দেখে মনে হলো ঝাঁপিয়ে পড়বে ওমরের ওপর। কিন্তু সামলে নিল। 'ঠিক আছে ঠিক আছে, ভুল করেছি, যান; এ রকম করে কথা বলা উচিত হচ্ছে না আমার। এতে আমাদের কারোরই ভাল হবে না...'

'আপনার হবে না।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে ওমরের দিকে তাকিয়ে রইল পোত্রাঘাই। তারপর কণ্ঠস্বর নরম করে বলল, 'দেখুন, সোনা খুব দামী জিনিস। আমার যেমন কাজে লাগবে, আপনারও লাগবে। শুধু শুধু সরকারকে দিতে যাবেন কেন? ভাগাভাগি করে নিই,

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

আপনার অর্ধেক, আমার অর্ধেক। এক টন সোনার অর্ধেক পেলেও আমি খুশি।'

'দুঃখিত, খুশি করতে পারলাম না আপনাকে,' চাঁছাছোলা জবাব দিল ওমর। 'আমার কাছে নেই। থাকলেও অর্ধেক তো দূরের কথা, একরত্তি সোনাও আপনাকে দিতাম না আমি। জেনসেন তো সোনাগুলো সরাতে দেখেছে। কোথায় রেখেছি বলেনি আপনাকে?'

'বলেছে। বরফের ওপর নাকি রেখেছেন।'

'তারপর কি ঘটেছে বলেনি?'

'না।'

'আমি বলব?'

'বলুন।'

'যেখানে রেখেছিলাম সেখানেই আছে এখনও।'

'কো-কো-কোথায় রেখেছিলেন?' প্রায় তোতলানো শুরু করল পোত্রাঘাই।

'বাকি কথাটাও আপনাকে বললে পারত জেনসেন। বোধহয় জানে না। তুষার পড়ছিল তো তখন, দেখেনি। ঠিক আছে, সে যখন বলেনি, আমিই বলছি। বলছি, আপনার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে। সোনাগুলোর পাহারায় একজনকে বসিয়ে রেখে আমি চলে গিয়েছিলাম প্লেন আনার জন্যে। ফিরে গিয়ে দেখি সে সেখানে নেই। কি ঘটেছিল জানেন? ও যেখানে বসেছিল, সেখানকার বরফ ভেঙে তাকে সহ ভেসে গিয়েছিল। যখন সে বুঝতে পারল, অনেক দেরি হয়ে গেছে। সরার আর সুযোগ পেল না। সোনা সহ ভাসতে ভাসতে চলে গেল। ওই সোনার স্তূপের ওপরই বসেছিল সে যখন আপনার জাহাজটা দেখতে পায়। পথে

তাকেই তুলে নিয়েছিলেন। এখন বুঝতে পারছেন তো কেন সোনাগুলো নিতে পারছি না আমি এবং কেন বসে আছি এখনও? সব শুনলেন। যান, এখন বিদেয় হোন।'

ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল পোত্রাঘাইয়ের চেহারা, কিশোরকে হাতে পেলে নির্দ্বিধায় খুন করত ওকে। এতে বোঝা গেল ওমরের কথা বিশ্বাস করেছে সে। পুরো এক মিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁসল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, যাচ্ছি। তবে যদি মিথ্যে বলে থাকেন, আবার আসব আমি।'

'বরফখণ্ডটা খুঁজে বের করুনগে, তাহলেই বুঝবেন সত্যি বলেছি কিনা,' মোলায়েম স্বরে জবাব দিল ওমর।

'তা তো করবই,' দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস শব্দ করল পোত্রাঘাই। 'তবে দয়া করে তখন আমার সামনে পড়বেন না। তাহলে জেনসেনের যে অবস্থা করেছি, আপনাদেরও করব।'

'ঠিক আছে, মনে থাকবে আমার।'

গোড়ালিতে ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল পোত্রাঘাই। দলবলকে ডেকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল পাহাড়ের দিকে।

ওদের যেতে দেখল ওমররা। পাহাড়ের আড়ালে ওরা হারিয়ে গেলে সঙ্গীদের দিকে ফিরে তাকাল ওমর। ঠোঁটে মৃদু হাসি।

'বললেন কেন ওকে?' ক্যাম্পবেল খুশি হতে পারেননি।

'ওর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে। সময় পেলাম। কাজটা শেষ করে ফেলতে পারব। আমার কথা বিশ্বাস করেছে ও। এখন গিয়ে বরফখণ্ডটা খুঁজে বেড়াবে। ওকে বিদেয় করতে না পারলে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকত, তর্কাতর্কি করতে করতে শেষে গোলাগুলি শুরু হতো। তারচেয়ে এটাই ভাল হলো না?'

'ভালই করেছেন,' কিশোর বলল। 'আমি তো ঘেমে গেছি

রীতিমত। ভয় পাচ্ছিলাম, কোন সময় সোনার ওপর বসানো চিহ্নটা দেখে ফেলে। দুই দুইবার হাতের কাছে পেয়েও বোকামি করে ফেলে দিয়ে গেল যখন জানবে, নিজের হাত কামড়ে খেয়ে ফেলবে পোত্রাঘাই।'

'হাত খাওয়া পোত্রাঘাইকে কেমন লাগে দেখতে ইচ্ছে করছে আমার,' মুসা বলল।

'কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই,' উঠে দাঁড়াল ওমর। 'চলো, সেরে ফেলি।'

একটা ঘণ্টা এক নাগাড়ে কাজ চলল। অর্ধেক সোনা এনে তোলা হলো দ্বিতীয় বিমানটাতে। মোটেও সহজ হলো না কাজটা। মস্ত ঝুঁকি নিতে হয়েছে ওদের। বরফখণ্ডটা ঠিকমত লাগেনি মূল ভূখণ্ডের গায়ে। মাঝে মাঝেই সরে গেছে স্রোতের টানে, ঘুরে ধাক্কা খেয়ে আবার লেগেছে। ধাক্কা খাওয়ার সময়টা আরও বিপজ্জনক। কোন কারণে ওই ফাঁকের মধ্যে কেউ পিছলে পড়ে গেলে ভর্তা হয়ে একেবারে মিশে যেত। বাড়ি খেয়ে বরফের চটা ভেঙে ছিটকে পড়েছে চারদিকে। সেগুলো লাগলেও মারাত্মক জখম হতো। যা-ই হোক, ভাগ্য ভাল, ওরকম কোন বিপদ-টিপদ ঘটল না।

কাজ যখন চলছে, তখনও পালা করে গিয়ে পাহাড়ে বসে পাহারা দিয়েছে ওরা। এখান থেকে গিয়েই সোজা জাহাজে উঠেছে পোত্রাঘাইরা। ছেড়ে গেছে জাহাজটা। খোলা পানিতে খোঁজাখুঁজি করে ফিরে এসে নোঙর করেছে আবার আগের জায়গায়।

রবিন পাহারা দিয়ে এসে রিপোর্ট করেছে, জাহাজের প্রধান মাস্তুলের ওপরে ক্রো-নেস্ট থেকে মাঝে মাঝেই আলোর ঝিলিক চোখে পড়েছে তার। গম্ভীর হয়ে কিশোর বলেছে, নিশ্চয় ওখানে

বসে পাহারা দিচ্ছিল কেউ। তার দূরবীনের কাঁচের ঝিলিক ছিল ওগুলো।

কিশোরের অনুমান যে ঠিক, সেটা প্রমাণ করার জন্যেই দৌড়ে এসে জানাল মুসা, 'আবার আসছে পোত্রাঘাই। এবার সঙ্গে একডজন লোক।'

'লড়াইটা আর ঠেকানো গেল না,' বরফে রয়ে যাওয়া সোনার বারগুলোর দিকে তাকাল ওমর। 'ওগুলো ওদের চোখে পড়তে দেয়া চলবে না। ফাঁকগুলো ঢেকে দিয়ে এসো, জলদি।'

'ওরা অনেক বেশি লোক,' চিন্তিত হয়ে পড়েছেন ক্যাম্পবেল। 'মারামারি বাধলে পারব না।'

তাঁর কথা যেন শুনতেই পায়নি ওমর। 'আধখানা বারও ওদের দেব না আমি। রোজার, তুমি প্লেনটা নিয়ে গাড আইল্যান্ডে ফিরে যাও। সোনাগুলো নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করবে।'

'ও-কে, বস। সোনাগুলো রেখে, তেল ভরে যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব। না কি বলেন?'

'ঠিক আছে।'

বিমানে গিয়ে উঠল রোজার। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল।

পাহাড় থেকে শেষবারের মত ফিরে এল মুসা। জানাল, লোকগুলোর হাতে অস্ত্র আছে। কারও হাতে রাইফেল, কারও বন্দুক।

'আসুক।'

চলতে শুরু করল রোজারের বিমান।

পাহাড় পেরোতে দেখা গেল দলটাকে। তাদের আসার ভঙ্গিতেই বোঝা যায়, এবার আর অত সহজে ফিরে যাবে না। তাঁবু থেকে পিস্তল বের করে আনার নির্দেশ দিল সবাইকে ওমর।

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com©

পকেটে বা অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখতে বলল, যাতে শত্রুরা দেখতে না পায়। বাক্সের ওপর বসে একটা রাইফেল দুই উরুর ওপর আড়াআড়ি ফেলে রাখল।

দশ গজ দূরে এসে সঙ্গের লোকগুলোকে থামতে ইশারা করল পোত্রাঘাই। লাইন দিয়ে দাঁড়াল ওরা।

'আবার কি কারণে এলেন?' কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল ওমর।

'কেন এসেছি, ভাল করেই জানেন আপনি,' করাত দিয়ে কাঠ কাটার মত খসখস শব্দ বেরোল পোত্রাঘাইয়ের গলা থেকে।

'মাথা থেকে সোনার পোকা বেরোয়নি এখনও?'

'ভেবেছিলেন বোকা বানাবেন আমাকে! মাস্তুলের ওপর থেকে আপনাদের ওপর চোখ রেখেছিল আমার লোক। কি করেছেন দেখেছে।'

'দেখতে নিশ্চয় খুব ভাল লেগেছে ওর।'

'বাজে কথা রাখুন। সোনাগুলো প্লেনে তুলতে দেখেছে ও।'

'তাহলে তো আর কোন দুশ্চিন্তাই থাকল না আপনার। ওগুলো এখন আকাশপথে নির্দিষ্ট জায়গায় রওনা হয়ে গেছে।'

'সব যায়নি। একটা প্লেনে করে এত সোনা নেয়া সম্ভব না। যা গেছে গেছে। বাকিগুলো পেলেই আমি খুশি।'

'কিন্তু আমি খুশি নই।'

'তাহলে...'

বিমানের শব্দে থেমে গেল পোত্রাঘাই। গর্জন করে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল রোজারের প্লেনটা। ছোট একটা জিনিস উড়ে এসে বরফের ওপর পড়ল ওটা থেকে। তাড়াতাড়ি গিয়ে তুলে নিল কিশোর। একটা সিগারেটের টিন। খুলতে ভেতর থেকে বেরোল এক টুকরো কাগজ। পড়ে হাসি ফুটল মুখে। ফিরে এসে

কানে কানে বলল ওমরকে। ওমরের মুখেও হাসি ফুটল। মাথা ঝাঁকাল সে। 'পোত্রাঘাই, কি যেন বলছিলেন? সোনা না দিলে কি যেন করবেন?'

'বলতে যাচ্ছিলাম, কেউ বেঁচে থাকবেন না।'

'ঠিক আছে, নাহয় দিয়েই দিলাম আপনাকে। কি করবেন ওগুলো নিয়ে?'

ওমরের প্রশ্নটা দ্বিধায় ফেলে দিল পোত্রাঘাইকে। 'কি করব মানে? নিয়ে আর একটা মুহূর্ত দেরি করব না। কেটে পড়ব এই নরক থেকে।'

মাথা নাড়তে নাড়তে ওমর বলল, 'তা আর পারছেন না। অনেক দেরি করে ফেলেছেন।'

হাসল পোত্রাঘাই। 'ঠেকাবেন আমাদের? ওই ক'টা ছেলেছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে?'

'আমরা না ঠেকালেও বরফে ঠেকাবে। আপনার জাহাজটা আটকা পড়েছে। খোলা সাগরের পথ এখন আধ মাইল লম্বা এক আইসবার্গ দিয়ে বন্ধ। চারপাশ থেকে আরও বরফ এসে ওটার আয়তন বাড়াচ্ছে এখন।'

হাসিটা মুছল না পোত্রাঘাইয়ের। 'কোন কথা বলেই আর ফাঁকি দিতে পারবেন না আমাকে।'

কাঁধ ঝাঁকাল ওমর। 'আমার সাবধান করা করলাম, বিশ্বাস করা না করা আপানার ইচ্ছে।'

'আপনি জানলেন কি করে?'

'আকাশ থেকে মেসেজটা পড়তে দেখলেন না? পাইলট ওপর থেকে সব দেখতে পেয়েছে। সেই খবরটাই জানিয়ে গেল আমাদের। স্টারি ক্রাউনের মত একই দুর্ভাগ্য বরণ করতে চলেছে

aminsumon@yahoo.com
www.murchona.com

আপনার বেত্রাঘাইও।'

শুকনো ঠোঁটে জিভ বোলাল পোত্রাঘাই। ওমরের শান্ত ভঙ্গি সতর্ক করে তুলল তাকে।

'আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে লাভ নেই,' ওমর বলল। 'বরং গিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারেন, কোনমতে জাহাজটাকে এখনও খোলা সাগরে বের করে নিতে পারেন কিনা। বাতাস কোন্ দিক থেকে বইছে জানেন তো? ওদিক থেকেই বরফ ঠেলে আনছে।'

'সরে এসে মাথাগুলো মূল বরফখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হলেই শেষ, আটকে গিয়ে প্রবাল প্রাচীরের মত বরফ প্রাচীর তৈরি করবে,' ক্যাম্পবেল বললেন, 'কোন জাহাজের সাধ্য নেই তখন আর ওই দেয়াল ভেদ করে।'

চট করে বিমানটার দিকে চোখ চলে গেল পোত্রাঘাইয়ের, ফিরে এসে স্থির হলো আবার ওমরের ওপর। ওর মনের কথা বোঝা কঠিন। 'আমি আটকা পড়লে আপনারাও পড়বেন। গুলি করে ঝাঁজরা করে দেব আপনার ওই বাহনটাকে, যাতে কোন দিন আর ডানা মেলতে না পারে।'

'আপনি গুলি করবেন, আর আমরা তখন বসে বসে আঙুল চুষব নাকি?'

ভয় দেখিয়ে কাবু করতে না পেরে অন্যপথে চেষ্টা করে দেখল পোত্রাঘাই, 'গোলাগুলি করলে দুই দলেরই ক্ষতি হবে...'

'বুঝতে তাহলে পারছেন।'

'জাহাজটা আটকা পড়লে আপনি কি আমাদের এখানে মরার জন্যে ফেলে যাবেন?'

হেসে উঠল ওমর, 'তো আর কি করব? কতগুলো ডাকাতকে

প্লেনে পুরে ঝামেলা বাধাতে যাব কেন? আপনারা বরফের মধ্যে জমে মরলে আমার কি ক্ষতি? বোকামি করে ফেলেছেন, পোত্রাঘাই। বেশি চালাকি করতে গিয়ে নিজের ফাঁদে নিজে পড়ে গেছেন। তবে এখনও আমার কথা যদি মেনে চলেন, বাঁচার একটা সুযোগ আমি করে দিতে পারি। জাহাজে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকুন। নিশ্চয় যথেষ্ট খাবার নিয়ে এসেছেন, না খেয়ে মরবেন না। আমি ফিরে গিয়ে সাহায্য পাঠাব। নেভির জাহাজ এসে যাতে আপনাদের তুলে নিয়ে যায়, সে-ব্যবস্থা করব। এখানে যা যা ঘটেছে, সব জানাব আমি কর্তৃপক্ষকে। কি করবেন, ভেবে দেখুন। যা সিদ্ধান্ত নেবার, জলদি নিন।'

জ্বলন্ত চোখে রাজ্যের ঘৃণা নিয়ে ওমরের দিকে তাকিয়ে রইল পোত্রাঘাই। আর একটা কথাও না বলে ঘুরে দাঁড়াল। এগিয়ে চলল পাহাড়ের দিকে। পেছনে চলল তার দলবল। পাহাড়ের কাছে পৌঁছে দাঁড়িয়ে গেল। ঘিরে দাঁড়াল তাকে বারোজন লোক। নিশ্চয় আলোচনা করছে। মিনিটখানেক পর ছয়জন লোক নিয়ে জাহাজের দিকে চলে গেল পোত্রাঘাই। বাকি ছয়জন এদিকে মুখ করে বসে পড়ল পাহাড়ের মাথায়।

বিড়বিড় করল ওমর, 'এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয় পোত্রাঘাই।'

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

এগারো

'কি করব আমরা এখন?' জানতে চাইল মুসা।

বাক্সের ওপর বসে দলটার দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে থেকে জবাব দিল ওমর, 'সেটাই ভাবছি।'

'পাহাড়ে বসে আছে কেন ওরা?'

'আমাদের পাহারা দিচ্ছে।'

'কতক্ষণ দেবে?'

'যতক্ষণ আমরা না নড়ব।'

'মানে সোনা তুলে আনতে না যাব?'

'হ্যাঁ।'

'গেলে খুব কি সমস্যা হবে?'

'গিয়ে দেখো।'

হতাশ ভঙ্গিতে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'কিশোর, কিছু বলো!'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে গভীর মনোযোগে চিন্তা করছিল কিশোর। মুসার কথায় ফিরে তাকাল, 'সব সমস্যারই সমাধান আছে।'

'তা তো বুঝলাম,' অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল মুসা, 'এখনকার সমস্যাটার সমাধান কি? বরফে জাহাজ আটকা পড়ার কথা শুনে

আমি তো ভেবেছিলাম পোত্রামাইয়ের কোমর ভেঙে গেছে।'

মুচকি হাসল কিশোর, 'তা তুমি ভাবতেই পারো। তবে অত দুর্বল মনের মানুষ হলে একটা ভাঙা জাহাজ নিয়ে কুমেরুতে আসার সাহস করত না সে। যে কোন মূল্যেই হোক, সোনাগুলো হাতানোর চেষ্টা করবে। লোকবল আছে তার। প্রয়োজন মনে করলে নির্দ্বিধায় গুলি করে মারবে আমাদের সবাইকে। সেটাই করতে এসেছিল। কিন্তু জাহাজ আটকা পড়ার খবর শুনে কাজটা স্থগিত রেখে ফিরে গেছে। আবার আসবে, জানা কথা।'

'এলেও প্লেন কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবে বলে মনে হয় না,' রবিন বলল। 'ওর জাহাজে নিশ্চয় এমন কেউ নেই যে প্লেন চালাতে জানে। আমাদের ওপর নির্ভর করতেই হবে তাকে। অন্তত একজনকে হলেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্যে। পুলিশের কাছে রিপোর্ট করে ওকে ফাঁসানোর জন্যে ওই একজনই যথেষ্ট।'

'সেটাও করবে কিনা সন্দেহ আছে। সবশেষে চিন্তা করবে আমাদের কাউকে নিয়ে যাওয়ার কথা, যদি অন্য সব উপায় ফেল করে। তার প্রথম কাজ এখন গিয়ে দেখা সত্যি সত্যি বরফে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে কিনা। জাহাজ বেরোনোর পথ বন্ধ হয়ে গেলেই যে এখানে আটকে থাকতে হবে তাকে, এমন কোন কথা নেই। সাময়িকভাবে আটকে গেলেও আবার চলা শুরু করতে পারে বরফ। পথ খুলে যেতে পারে। না গেলে বোমা মেরে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করবে। আমার মনে হয় না ডিনামাইট না নিয়ে এই অঞ্চলে এসেছে সে।'

'নিয়েই এসেছে,' ক্যাম্পবেল বললেন। 'আমি যখন ছিলাম, তখনও ডিনামাইট ছিল জাহাজে।'

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'বোমা মেরে যদি রাস্তা করতে না পারে, লাস্ট যা করেছিল সেই কাজ করবে। ডিঙিগুলো বরফের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে চলে যাবে খোলা সাগরের পাড়ে। পানিতে নামিয়ে ভেসে পড়বে। মাত্র একটা ভাঙা নৌকা নিয়ে লাস্ট একা যদি সাগর পাড়ি দিতে পারে, কয়েকটা ডিঙি আর বিশজন লোক নিয়ে পোত্রাঘাই কেন পারবে না? রোজারের কথা ঠিক কিনা দেখতে গেছে সে। ঠিক হোক বা না হোক, ভয় পাবে না। পরের বার আসবে আমাদের সবাইকে খুন করে সোনাগুলো ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে।'

'আমরা কি তখন চুপ করে বসে থাকবে নাকি?' ঝাঁজাল কণ্ঠে মুসা বলল, 'ওর লোকও মারা যাবে।'

'হাহ্!' ওমর বলল, 'ওসবের তোয়াক্কা সে থোড়াই করে। নিজের জীবন ছাড়া দুনিয়ার আর কারও কথা ভাবে কিনা ওই লোক, সন্দেহ।'

কিশোর বলল, 'আমাদের ওপর গুলি চালানো নিয়ে অত চিন্তা করছি না আমি। ভাবছি, আরও সহজ কাজটা করবে কিনা সে। প্লেনের ট্যাংকে কয়েকটা ফুটো করে দিলেই ওর চেয়ে বেশি বিপদে পড়ব আমরা। আটকাটা তখন আমরা পড়ব, ও নয়। এবং ও সেটা জানে। যদি দেখে জাহাজটা নিয়ে বেরোনোর সামান্যতম আশাও আছে, সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে প্রথমে ট্যাংক ফুটো করবে, তারপর আমাদের খতম করার চেষ্টা করবে।'

'সময় থাকতে থাকতেই কেটে পড়ছি না কেন তাহলে আমরা?' ক্যাম্পবেলের প্রশ্ন।

'ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়ে সোনাগুলো দিয়ে যাব ওই শয়তানটাকে? তাহলে তো ও-ই জিতল,' রেগে উঠল ওমর।

'মাথায়ও আনবেন না ও-কথা।'

'তারচেয়ে বরং সোনাগুলো তুলে নিয়ে আসি,' প্রস্তাব দিল মুসা। 'এ ভাবে বসে থাকলে আমরাও বরফের টুকরো হয়ে যাব।'

'সোনাগুলো আনতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোলাগুলি শুরু হয়ে যাবে,' কিশোর বলল। 'এক মিনিট বোসো। আরেকটু ভেবে নিই।'

সবাই চুপ হয়ে গেল। আরেকটা সিগারেট ধরাল ওমর। দিগন্তের দিকে চোখ। লাল সূর্যটার মত ওদিককার বরফও রক্তলাল হয়ে গেছে।

'ধরা যাক,' আচমকা কথা বলে উঠল কিশোর, 'নৌকা নিয়েই সাগর পাড়ি দেয়ার কথা চিন্তা করল পোত্রাঘাই। কোনদিকে যাবে? গাউ আইল্যান্ড? গেলেই তো ক্যাঁক করে ধরবে।'

'যাবে না ওখানে,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে। পারবেও সেটা, যদি সাগরে বড় ধরনের ঝড় না ওঠে। রসদপত্রের অভাব নেই তার। খোলা নৌকায় করে এর চেয়ে দূরে চলে যাওয়ার রেকর্ড আছে মানুষের। সে-ও পারবে।'

আবার নীরবতা। বসে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে উঠল মুসা। আর থাকতে না পেরে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। দুই হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'আমি আর বসে থাকতে পারছি না। ওফ, কি ঠাণ্ডারে বাবা। জমে একেবারে বরফ হয়ে গেলাম।'

ভারী দম নিয়ে কিশোর বলল, 'হ্যাঁ, কিছু একটা করা উচিত আমাদের। সোনাগুলো প্লেনে তোলার চেষ্টা করব। তাতে অ্যাকশনে চলে যাবে শত্রুপক্ষ। যায়, যাক। এ ছাড়া আর কিছু করার নেই আমাদের।' ওমরের দিকে তাকাল সে, 'ওমরভাই,

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

আমরা সোনা আনতে গেলেই গুলি শুরু করবে, তাই না?'

'কোন সন্দেহ নেই,' জবাব দিল ওমর। 'নইলে ছয়জন লোককে বসিয়ে রেখে গেল কেন? পাহারা দেয়ার জন্যে হলে একজনকে রেখে যাওয়াই যথেষ্ট ছিল।'

'ধরা যাক, সোনাগুলো তুলে আনতে পারলাম আমরা,' মুসা বলল, 'এখনই কি চলে যাব?'

'একটা অসুবিধে আছে,' ওমর বলল।

'খাইছে! খালি অসুবিধার কথা। আবার কি অসুবিধে?'

'জেনসেন। ওকে মরার জন্যে ফেলে রেখে যেতে পারি না আমরা। তবে সেটা পরের কথা। সোনাগুলো আনার পর ওকে উদ্ধার করার কথা ভাবব।'

'ওরা গুলি শুরু করলে আমরাও তো তার জবাব দিতে পারি,' ক্যাম্পবেল বললেন।

'পারি, এবং সেটা করবও। তবে একই সঙ্গে সোনা তুলে আনা, আবার গুলির জবাব দেয়া—কঠিন হয়ে যাবে আমাদের জন্যে। তা হোক। মুসা, তোমাকে দিয়েই শুরু করা যাক। তোমার যখন এতই ইচ্ছে, দৌড়ে গিয়ে একটা বার তুলে আনতে পারবে? দেখতে চাই ওরা কি করে।'

'পারব।'

'ঝুঁকি আছে কিন্তু।'

'এখানে আসাটাই তো একটা মস্ত ঝুঁকির ব্যাপার। আরেকটুতে কিছু এসে যাবে না। আমার দিকে গুলি করে করুক, কিন্তু যদি প্লেনের ট্যাংক ফুটো করতে শুরু করে?'

'এক কাজ করতে পারি,' রবিন বলল, 'আপনারা বারগুলো তুলে এনে এখানে জমা করতে থাকুন, আমি ততক্ষণ প্লেনটা নিয়ে

আকাশে চক্কর দিই, তাহলেই আর ওটার ক্ষতি করতে পারবে না।'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল ওমর, 'এ ভাবে তেল খরচ করাটা ঠিক হবে না। আর চক্কর দিলেই বা লাভ কি? সোনাগুলো নেয়ার জন্যে নিচে নামতেই হবে আবার। ফুটো করার চিন্তাই যদি থাকে, তখন করবে।' দুরবীনটা নিয়ে চোখে লাগাল সে। 'জাহাজ থেকে একটা ডিঙি নামিয়ে আইসবার্গের দিকে যাচ্ছে ওরা। মুসা, দৌড় দাও। যদি দেখো অবস্থা বেগতিক, দেরি না করে ফিরে আসবে।'

মুসাকে সোনাগুলোর দিকে এগোতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল লোকগুলো। একজন দৌড় দিল জাহাজের দিকে।

'ওর বসকে জানাতে যাচ্ছে,' আনমনে বলল ওমর।

বাকি পাঁচজন নিজেদের মধ্যে দ্রুত আলোচনা করে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড়ের ওপাশে। তবে মুহূর্ত পরেই এক এক করে উঁকি দিতে শুরু করল আবার মাথাগুলো। অস্ত্রগুলো বেরিয়ে এল। গুলির শব্দ হলো। মুসার কয়েক গজ দূরে তুষার ওড়াল বুলেট।

'ও করছে কি?' শঙ্কিত হলো ওমর। 'গুলি চলার সঙ্গে সঙ্গে তো ওকে ফিরে আসতে বলেছিলাম।'

'না নিয়ে ফিরবে না,' ক্যাপ্টেনও উদ্বিগ্ন। 'বড্ড একগুঁয়ে ছেলে। ধরে গিয়ে নিয়ে আসব নাকি?'

নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটা চলেছে কিশোরের। কারও কথাই যেন কানে যায়নি। বলতে লাগল, 'এখানকার আলো বড় অদ্ভুত, নানা রকম কারসাজি করে; তা ছাড়া তুষারে গুলি করে লাগানো বড় শক্ত।'

'কিন্তু তাই বলে চুপচাপ বসে থেকে ওদের গুলি করে যাওয়ার

anmsumon@yahoo.com www.murchona.com©

সুযোগ দেয়া যায় না,' ওমর বলল। 'বাধা দেয়া দরকার। রবিন, দেখো হামাগুড়ি দিয়ে ওদের একপাশে চলে যেতে পারো নাকি। বরফের স্তূপের আড়ালে বসে তাহলে ঘামিয়ে তুলতে পারবে ব্যাটাদের। আমরা ওদের মাথা নামিয়ে রাখার বন্দোবস্ত করছি। শুধু পিস্তল নিয়ে যেয়ো না। রাইফেল নিয়ে এসো তাঁবু থেকে।'

দৌড়ে গিয়ে তিনটা রাইফেল বের করে আনল কিশোর আর রবিন। দুজনে দুটো নিয়ে তৃতীয়টা দিল ক্যাম্পবেলকে।

পাহাড়ের ওপরে আবার গুলির শব্দ হলো। এবারও মুসার কয়েক গজ দূরে তুষার ছিটকে উঠল।

গম্ভীর কণ্ঠে বলল ওমর, 'সবাই মাথা নিচু করে রাখো। আমি বললেই গুলি শুরু করবে। অহেতুক গুলি নষ্ট কোরো না। তবে লাগুক আর না লাগুক, মাথা তুলতে দেবে না ব্যাটাদের।'

যে বাক্সটার ওপর বসে ছিল ওমর, সেটার আড়ালে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। গুলি করল একটা মাথা সই করে।

ঝট করে মাথা নামিয়ে ফেলল লোকটা। তার মাথার কাছে তুষার ওড়াল না বুলেট। 'ওপর দিয়ে চলে গেছে। টার্গেটের ফুটখানেক নিচে এইম করবে।'

আবার গুলি করল সে। নেমে গেল মাথাটা। গুলি লেগেছে কিনা বোঝার উপায় নেই।

কিশোর আর ক্যাপ্টেনও গুলি শুরু করলেন। পাহাড়ের ওপরে একজনও আর আগের মত মাথা তুলে রাখতে পারল না।

'চমৎকার,' হাসিমুখে বলল ওমর, 'এটা বজায় রাখতে পারলে সোনা নিয়েই ফিরে আসতে পারবে মুসা।'

থেমে থেমে গুলি চলল।

কাঁধে একটা বার নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল মুসা।

'ভেরি গুড। প্লেনের কাছে রাখো ওটা, কেবিনের দরজার নিচে,' ওমর বলল। 'আর আনতে পারবে?'

'পারব না মানে?' ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল মুসার। বারটা রেখে আবার দৌড় দিল।

পাহাড়ের দিকে কড়া নজর রেখেছে ওমর। মাথা উঠতে দেখলেই গুলি করে।

আরেকটা বার নিয়ে ফিরে এল মুসা। ওমরের বলার অপেক্ষায় রইল না আর। বারটা নামিয়ে রেখেই আরেকটা আনতে ছুটল।

আবার আগের মতই থেমে থেমে গুলি করতে লাগল ওমর। কিশোর আর ক্যাপ্টেনও করছেন। হঠাৎ শোনা গেল পাহাড়ের একপাশ থেকে গুলির শব্দ। পৌঁছে গেছে রবিন।

'পরিস্থিতি এখন আমাদের আয়ত্তে,' ওমর বলল। 'ক্যাপ্টেন, আপনার আর এখানে থাকার দরকার নেই। মুসাকে সাহায্য করুনগে। কিশোর, তুমিও যাও। আমি আর রবিন আটকে রাখতে পারব ওদের।'

রাইফেল ফেলে রেখে ছুটল কিশোর আর ক্যাম্পবেল।

পরের একঘণ্টা একভাবে কাজ চলল। ওমরের নজর পাহাড়ের দিকে। কেবিনের দরজার নিচে সোনার স্তূপ জমছে। অবস্থার পরিবর্তন ঘটল যখন সোনার একটা বার নিয়ে ফিরে এসে কিশোর জানাল, সাগরের দিক থেকে নৌকায় করেও লোক আসছে।

ফিরে তাকাল ওমর। যে বরফখণ্ডতে সোনাগুলো রয়েছে, তার ওপাশে দেখা যাচ্ছে নৌকাটাকে। কি ঘটেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না। আইসবার্গ দেখতে গিয়েছিল পোত্রাঘাট। গুলির শব্দ শুনে জাহাজে না ফিরে সরাসরি এদিকে চলে এসেছে। বরফখণ্ডটার ওপরই নামবে। বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে সে।

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com ©

দুদিক থেকে আক্রান্ত হবে তখন ওমররা। কুলাতে পারবে না। প্রথমে অবশিষ্ট সোনাগুলো তুলে নেয়ার চেষ্টা করবে পোত্রাঘাই। তারপর প্লেনটাকে আক্রমণ করবে। এত কাছে থেকে মিস করার কথা নয়। একবার প্লেনটাকে অকেজো করে দিতে পারলে বাকি কাজ সারার জন্যে তাড়াহুড়ো করা লাগবে না আর ওর, ধীরে সুস্থেও করতে পারবে।

দেরি করার উপায় নেই। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে এখন। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল ওমর, 'তোমাদের কদ্দূর?'

'গোটা ছয়েক বার রয়ে গেছে এখনও,' জবাব দিল কিশোর।

'বাদ দাও, থাক ওগুলো। যেগুলো আনা হয়েছে প্লেনে তুলে ফেলো। তাড়াতাড়ি করো।'

কেবিনে দ্রুত বারগুলো তুলে ফেলতে লাগল কিশোররা।

রাইফেল হাতে আগের মতই পাহারায় রইল ওমর। পাহাড়ের ওপর কেউ মাথা তুললেই গুলি করে। প্লেন আর কিশোরদের কভার করে রাখল সে।

নৌকা থেকে গোলাগুলি শুরু হয়নি এখনও। নিখুঁত নিশানা করা সম্ভব না বলেই বোধহয় করছে না। কিন্তু ওমর জানে, বরফের ওপর পা রাখামাত্র গুলি শুরু করবে ওরা। এ সময় ফিরে এল রবিন। জানাল, জাহাজ থেকে নেমে ছুটে আসছে জনা সাতেক লোক। এখন সে কি করবে জানার জন্যে এসেছে।

'সাত, না?' জোরে জোরে গোণা শুরু করল কিশোর। 'পাহাড়ের ওপর ছয়, আর নৌকায় পাঁচ, তারমানে আঠারো।' ক্যাম্পবেলের দিকে তাকাল সে। ব্যস্ত হয়ে কেবিনে সোনা তুলছেন। 'ক্যাপ্টেন, পোত্রাঘাইয়ে ক'জন লোক ছিল?'

'আমি যখন ছিলাম, উনিশজন।'

'আপনি আর জেনসেন সহ?'

'না।'

'তারমানে জাহাজ খালি করে সবাই চলে আসছে।'

কাজ করতে করতে জবাব দিলেন ক্যাম্পবেল, 'জাহাজে থেকে আর কি করবে, এখানেই লোক দরকার ওদের। তবে মনে হয় একজনকে রেখে এসেছে, এক চীনা বাবুর্চি, অবশ্য যদি এবারেও সেই লোকটা এসে থাকে। বুড়ো মানুষ, কানেও শোনে না। ওর এখানে এসে লাভ নেই, কিছু করতে পারবে না।'

'গুড,' কি যেন ভাবছে কিশোর। 'ওমরভাই, মনে হয় তুলে আনা যাবে লোকটাকে।'

'কোন লোক?' ভুরু কুঁচকাল মুসা।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'জেনসেনের কথা কি ভুলে গেলে? বেচারা। গুলি খেয়ে হয়তো মরেই গেছে। তাইলে আর কিছু করার থাকবে না আমাদের। কিন্তু জখম হয়ে পড়ে থাকলে ওকে বাঁচাতেই হবে। এখানে রেখে গেলে মেরে ফেলবে পোত্রাঘাই। কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে কোনমতেই তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না পোত্রাঘাই।'

সোনা তোলা শেষ। পোত্রাঘাইয়ের নৌকাটাও পৌঁছে গেছে। বরফের ওপর নামতে শুরু করেছে ওরা। দুশো গজ দূরে রয়েছে এখনও।

পাহাড়ের দিকে ঘন ঘন কয়েকটা গুলি করে ওদের মাথা কিছুক্ষণের জন্যে নামিয়ে দিল ওমর। তারপর দৌড়ে গিয়ে প্লেনে চড়ে নিজের সীটে বসল। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। বাকি সবাই উঠল। দরজা লাগিয়ে দিল মুসা। কিশোর গিয়ে বসল জানালার ধারে। জানাল, দৌড় দিয়েছে পোত্রাঘাই আর তার সঙ্গীরা। প্লেনটাকে

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

ধরার জন্যে মরিয়া।

'ওরা ভাবছে আমরা বাড়ি যাচ্ছি,' হেসে বলল রবিন। 'কিন্তু যখন দেখবে জাহাজটার কাছে গিয়ে নেমেছি, আমাদের আটকানোর জন্যে লোক রেখে আসেনি বলে কপাল চাপড়াতে থাকবে।'

'কিন্তু লাভ হবে না কোনও,' হেসে বলল মুসা। 'কপাল চাপড়ানোই সার।'

বারো

নিরাপদেই আকাশে উড়ল বিমান। বড় একটা চক্কর দিল ওমর। ওপর থেকে নিচের দৃশ্য অনেক বেশি দূর পর্যন্ত একবারে চোখে পড়ে। শত্রুপক্ষের প্রতিটি লোককে দেখতে পাচ্ছে। নৌকা থেকে যারা নেমেছে–পোত্রাঘাই আর তার সঙ্গের লোকগুলো, হাঁ করে তাকিয়ে রইল প্লেনটার দিকে। ওদের ওপর দিয়ে পার হয়ে আসার সময় পটাপট রাইফেলগুলো উঁচু হয়ে গেল। গুলি করছে বোঝা গেল, কিন্তু এত ওপরের সচল একটা টার্গেটকে লাগানো সহজ নয়।

ওদের গুলির পরোয়া করল না ওমর। তার একমাত্র লক্ষ, ভারী বোঝা নিয়ে বিমানটাকে অক্ষত রেখে ঠিকমত ল্যান্ড করানো। সাধারণ অবস্থায় এত সতর্ক হতো না সে। কিন্তু এখন

স্কিনটা ভাল থাকার ওপরই নির্ভর করছে ওদের বাঁচামরা। সবাই বুঝতে পারছে সেটা। কেউ কথা বলছে না।

যাই হোক, আবার নিরাপদেই অবতরণ করল বিমান। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই। পোত্রাঘাইয়ের দুশো গজ দূরে এসে থামল। জাহাজের ডেকে একজন লোককেও দেখা গেল না।

সঙ্গে করে প্যাকিং বাক্সের তক্তা নিয়ে আসা হয়েছে। লাফিয়ে নেমে দৌড়ে গিয়ে স্কি'র নিচে সেগুলো ঢুকিয়ে দিল রবিন।

অন্যেরাও নেমে পড়ল। রবিনকে ওখানে থেকে বিমান পাহারা দিতে বলে দ্রুতপায়ে জাহাজের দিকে এগোল ওমর। বরফে খুঁটি গেড়ে তার আর মোটা কাছি দিয়ে জাহাজটাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। জেনসেন যদি কোথাও থাকে, জাহাজেই আছে। ওকে পাওয়ার ব্যাপারে মিথ্যে বলেনি পোত্রাঘাই। জেনসেন না বললে সেনাগুলো নামানোর কথা সত্যি জানত না সে।

হাত নেড়ে ক্যাম্পবেলকে ডাকল ওমর। 'ক্যাপ্টেন, তাড়াতাড়ি আসুন। জাহাজটার কোথায় কি আছে, ভাল জানেন আপনি। জেনসেনকে কোথায় বন্দি করে রাখা যেতে পারে, বলতে পারবেন। কিশোর, আমাদের পেছনে থাকো। কভার দিতে দিতে এগোবে। মুসা, তুমি জাহাজটার সামনে থাকো। কেউ কিছু করতে এলে নির্দ্বিধায় গুলি চালাবে।'

এতক্ষণেও কেউ বেরিয়ে এল না ডেকে। তারমানে কোন লোক নেই, সবাই নেমে চলে গেছে। পাশ থেকে ঝুলছে একটা দড়ির সিঁড়ি। ওটা বেয়ে দ্রুত উঠে গেল ওমর। নিচের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ক্যাম্পবেল আর কিশোর না ওঠা পর্যন্ত।

'অ্যাই, কেউ আছো?' হাঁক দিল ওমর।

জবাব এল না।

anmsimon@yahoo.com
www.murchona.com

কম্প্যানিয়ন-ওয়ে ধরে হেঁটে গেল ওমর। নিচে নামার আগে দূরে পোত্রাঘাইয়ের নৌকাটার দিকে তাকাল। যারা নেমে গিয়েছিল, তারা আবার ফিরে এসে নৌকায় নামতে শুরু করেছে। নিশ্চয় জাহাজে ফিরে আসবে।

আপনমনে হাসল ওমর। 'আর কিছু না হোক, পোত্রাঘাইকে জন্মের ভয় দেখান দেখিয়েছি। ও নিশ্চয় ভাবছে জাহাজটায় আগুন ধরানোর জন্যে নেমেছি আমরা। আচ্ছা শিক্ষা হয়েছে ব্যাটার।...ক্যাপ্টেন, চলুন নিচে যাওয়া যাক। পথ দেখান।'

আগে আগে চললেন ক্যাম্পবেল। সিঁড়ির মাথায় এসে থামলেন। 'এখানে দাঁড়ান। সবার যাওয়ার দরকার নেই। আমি নিচে থেকে দেখে আসি।'

সিঁড়িতে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি।

পাঁচ মিনিট পরেই ফিরে এলেন। রাগে লাল হয়ে গেছে চোখমুখ। কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'যা ভেবেছিলাম। ওকে তালা আটকে রেখেছে শয়তানটা।'

'চাবিটা পাওয়া যাবে না?'

'পেয়েছি। পোত্রাঘাইয়ের কেবিনে। আসুন, বের করে নিয়ে আসি।'

'অবস্থা কেমন ওর?'

'খুব খারাপ। জখম হয়েছে। রক্ত ঝরে ঝরে কাহিল, আধমরা। রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে শার্ট। কাঁধে গুলি খেয়েছে। পালানোর জন্যে দৌড় দিয়েছিল বোধহয়, গুলি করে থামিয়েছে। বাঁচবে বলে মনে হয় না।'

লম্বা দম নিল ওমর। শান্তকণ্ঠে বলল, 'তা-ও চলুন, চেষ্টা করে দেখা যাক। প্লেনে তুলে নিয়ে যাব। কপাল ভাল হলে বাঁচবে।'

কিশোর, তুমি এখানেই থাকো।'

পকেট থেকে পিস্তল বের করে হাতে নিল কিশোর। ওমরকে নিয়ে আবার নিচে চলে গেলেন ক্যাপ্টেন। ফিরে আসতে দেরি হলো না। প্রায় বয়ে আনতে হয়েছে জেনসেনকে। ওদের আসতে দেখেই আর দাঁড়াল না কিশোর, দড়ির সিঁড়ির দিকে হাঁটা দিল।

ওপর থেকে জেনসেনকে নামাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো। ভীষণ ভারী লোকটা, তার ওপর পরেছে কুমেরুর জবরজং পোশাক। চারজনে মিলে অনেক কায়দা-কসরত করে তারপর নামাল। বয়ে নিয়ে চলল প্লেনে তোলার জন্যে।

নৌকা নিয়ে প্রাণপণ বেগে ছুটে আসছে পোত্রাঘাই। ডাঙায় যারা ছিল, তারাও দৌড়ে আসছে। নৌকাটার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল কিশোর। তারপর বলল, 'ওমরভাই, আপনারা উঠুন, আমি আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'জাহাজটার দড়ি কেটে দিতে।'

আঁতকে উঠলেন ক্যাপ্টেন, 'সর্বনাশ, বলো কি! তীরের দিক থেকে হাওয়া বইছে। দড়ি কেটে দিলে ভেসে যাবে তো জাহাজটা। বরফে বাড়ি লেগে ডুবে যাবে।'

'যাওয়ার জন্যেই তো কাটব। এখন জাহাজের জন্যে মায়া দেখানোর সময় নেই, তা-ও শত্রুর জাহাজ। ভেসে গেলে ওটা বাঁচাতে ছুটবে পোত্রাঘাই, আমরা কিছুটা বেশি সময় পাব। নিশ্চিন্তে প্লেনটা ওড়াতে পারব।'

বলে আর দাঁড়াল না কিশোর। দৌড়ে গিয়ে হান্টিং নাইফ দিয়ে পোঁচ মেরে দড়ি কেটে দিল। তারগুলো খুলে দিল খুঁটি থেকে। জাহাজটা সরতে শুরু করল কিনা দেখার প্রয়োজন বোধ

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

করল না। দৌড়ে ফিরে এল বিমানের কাছে।

অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছে ততক্ষণে পোত্রাঘাই। পড়িমরি করে ছুটে আসছে ডাঙায় যারা আছে তারা।

'তাড়াতাড়ি পালানো দরকার,' ওমর বলল। 'ওঠো, ওঠো সব।'

জেনসেনকে প্লেনে তোলাটাও কম কষ্টকর হলো না। কেবিনের মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে তাতে আরাম করে শুইয়ে দেয়া হলো।

'ফার্স্ট এইড দেয়া দরকার,' ওমর বলল। 'নইলে গাউ আইল্যান্ড পর্যন্তও পাড়ি দিতে পারবে না, তার আগেই শেষ হয়ে যাবে।'

ওষুধের বাক্স বের করা হলো। ওটা খুলতে গিয়ে নাক কুঁচকে বাতাস শুঁকতে লাগল ওমর। ভাঁজ পড়ল কপালে। 'পেট্রলের গন্ধ মনে হচ্ছে না?'

মুসাও পেয়েছে গন্ধটা, 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'দেখো তো, কোনখান থেকে আসছে।'

বেরিয়ে গেল মুসা।

জেনসেনের সেবা করতে বসল ওমর। তাকে সাহায্য করলেন ক্যাম্পবেল। কাপড় খুলে ক্ষতটা বের করা হলো। ওষুধ লাগানো তো দূরের কথা, সাধারণ একটা ব্যান্ডেজও বেঁধে দেয়নি পোত্রাঘাই।

দুঃসংবাদ নিয়ে ফিরে এল মুসা। জানাল, গুলি লেগে পেট্রলের ট্যাংক ফুটো হয়ে গেছে। পেট্রল বেশি পড়তে পারেনি। 'চিউয়িং গাম দিয়ে ফুটোটা বন্ধ করে দিয়ে এসেছি,' বলল সে।

একটা মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না। তারপর জেনসেনের দিক থেকে মুখ না ফিরিয়েই ওমর বলল, 'এতে হবে না। ভালমত

বন্ধ করোগে।'

'কিন্তু সময় লাগবে তো। ততক্ষণে যদি লোকগুলো এসে পড়ে?'

'কিছু করার নেই। আকাশে পেট্রল শেষ হলে মরতে হবে। ফুটো ট্যাংক নিয়ে মেরুসাগরের ওপর দিয়ে উড়তে রাজি নই আমি। যত তাড়াতাড়ি পারো—' বেরিয়ে যাচ্ছিল মুসা, হাত তুলে তাকে থামাল ওমর, 'দাঁড়াও। এখানে থেকে ফুটো বন্ধ করেও লাভ হবে না। ওরা চলে আসবে। আরও অসংখ্য ফুটো করে দেবে ট্যাংকে। তারচেয়ে বরং পুরানো ক্যাম্পে ফিরে যাই। আমাদের যেতে দেখলে আবার ওদিকে যাবে ওরা। সময় লাগবে। এই সুযোগে ট্যাংকটা মেরামত করে ফেলতে পারব আমরা।'

'সেটাই ভাল হবে,' কিশোর বলল। 'যান, আপনি স্টার্ট দিনগে। জেনসেনকে আমরা দেখছি।'

'আবহাওয়াও কিন্তু আবার খারাপ হওয়ার পথে,' আরেকটা দুঃসংবাদ দিলেন ক্যাপ্টেন। 'ব্যারোমিটার নিচে নামছে। ঠাণ্ডাটা টের পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি,' বলে চলে গেল ওমর।

জানালার কাছ থেকে মুসা জানাল, জাহাজের কাছে পৌঁছে গেছে নৌকাটা। বরফ মাড়িয়ে হেঁটে আসছে যারা, তারা রয়েছে পাঁচশো গজ দূরে। তবে দৌড়ানো বন্ধ হয়ে গেছে। পা টেনে টেনে আসছে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বোঝা যায়।

স্টার্ট নিল ইঞ্জিন। গরম হওয়ার জন্যে মিনিট দুয়েক সময় দিল ওমর। তারপর উড়ল। সোজা রওনা হলো পুরানো ক্যাম্পের দিকে। বড় একটা চক্কর দিয়ে দেখে নিশ্চিত হয়ে নিল শত্রুরা সব চলে গেছে, নাকি কেউ পাহারা দেয়ার জন্যে রয়ে গেছে এখনও।

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

ল্যান্ড করেই মুসাকে বলল, 'জলদি যাও, মেরামত করে ফেলো ফুটোটা।...কিশোর, সময় তো আছে হাতে। আপদগুলোও বিদেয় হয়েছে। বাকি সোনার বারগুলোই বা ফেলে যাই কেন?'

হাসিমুখে কিশোর বলল, 'কোন কারণ নেই ফেলে যাওয়ার।'

দরজা খুলে নামতে শুরু করল সবাই।

লাফ দিয়ে বরফের ওপর নেমে আকাশের দিকে তাকাল ওমর। আবার মেঘ জমতে আরম্ভ করেছে। নিঃশ্বাসের বাতাস একটা মুহূর্ত ধোঁয়ার মত ঝুলে থাকছে বাতাসে, তারপর বরফের কুচি হয়ে ঝরে পড়ছে।

বাকি সোনার বারগুলোও তুলে আনা হলো। প্রতিটি মিনিট যাচ্ছে আর অবনতি ঘটছে আবহাওয়ার। কাজ শেষ হয়নি এখনও মুসার। তাকে সাহায্য করতে গেল কিশোর। দুজনে মিলেও শেষ করতে পারছে না। ভয়াবহ ঠাণ্ডা কাজে দেরি করিয়ে দিচ্ছে ওদের। হাত থেকে দস্তানা খুলে নিতে পারলে আরও তাড়াতাড়ি হতো, কিন্তু ফ্রস্টবাইটের ভয়ে খুলতে পারছে না। আর ধাতু যে রকম ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, হাত ছোঁয়ালেই চামড়া খুলে আসবে, গরম ধাতুতে ছোঁয়ানোর মত। দু'জনেই হাত ঝাড়ছে, বাড়ি মারছে তালুতে তালুতে, রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখার জন্যে। গরম কফি বানিয়ে ওদের এনে দিল রবিন। রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে ওমর।

ইতিমধ্যে শত্রুরাও বসে নেই। শেষবারের মত মরিয়া আক্রমণ চালিয়ে সোনাগুলো কেড়ে নিতে আসছে পোত্রাঘাই। বার বার হাঁটাহাঁটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওর লোকেরা। জাহাজটাকে আবার কিনারে ভিড়াল সে। ডাঙায় যারা ছিল তাদের তুলে নিল। তারপর সোজা ছুটে আসতে লাগল জাহাজ নিয়ে, নৌকা নিয়ে

এসে যেখানে নেমেছিল সেই জায়গাটা লক্ষ করে। সামনে ছোট ছোট বরফের চাঙড় পড়ছে। ওগুলোও বিপজ্জনক। কিন্তু পরোয়াই করছে না সে। ঘুরপথে গেলে দেরি হবে, তাই সেসব বরফ ছিন্নভিন্ন করে সরাসরি ছুটে আসছে। সোনার নেশা পাগল করে তুলেছে ওকে। হিতাহিত জ্ঞানও নেই যেন আর।

দু'দিক থেকে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করেছে পোত্রাঘাই, সেটা বোঝা গেল যখন আধমাইল দূরে থাকতে আধডজন লোককে তীরে নামিয়ে দিল সে। রাইফেল হাতে অর্ধচন্দ্রাকারে সারি দিয়ে এগোতে শুরু করল লোকগুলো। কিছুটা ঘুরে যে বরফখণ্ডটায় সোনা ছিল সেটার সরু প্রান্তের দিকে এগোতে লাগল জাহাজ। ওদিকে ভিড়িয়ে হেঁটে এলে তাড়াতাড়িও হবে, ভিন্ন দিক থেকে হামলাও চালাতে পারবে বিমানের ওপর।

'আবার গরম হয়ে উঠছে পরিস্থিতি,' দেখতে দেখতে বললেন ক্যাম্পবেল। 'গুলির রেঞ্জের মধ্যে আসার আগেই পালাতে না পারলে বিপদে পড়ে যাব।'

এই সময় মুসা আর কিশোর এসে জানাল, ফুটো মেরামত হয়ে গেছে।

'উঠে পড়ো,' বলেই বিমানে উঠে পড়ল ওমর।

'বাপরে বাপ, যা ঠাণ্ডা!' হাত দুটো বাড়ি মারতে মারতে বলল মুসা। 'এত ঠাণ্ডায় এ সব কাজ করা যায় নাকি!'

ককপিটে বসল ওমর। স্টার্ট দিল। কো-পাইলটের সীটে বসল মুসা। একটা ইঞ্জিন গর্জে উঠল, কিন্তু অন্যটা চুপ করে রইল। কোন শব্দই নেই। আবার চেষ্টা করল ওমর। চালু হলো না ইঞ্জিনটা। মুসার দিকে তাকাল, 'ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।' আবার চেষ্টা করল। এবারেও নীরব হয়ে রইল ইঞ্জিন। আরও একবার চেষ্টা

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

করার পর বলল, 'হবে না। হীটার চালাও।'

মুখটাকে বিকৃত করে ফেলল মুসা, যেন নিম চিবিয়ে ফেলেছে, 'বন্ধ হওয়ার আর সময় পেল না! চলে আসবে তো পোত্রাঘাইরা।'

কাঁধ ঝাঁকাল ওমর। 'কিছু করার নেই। এত ভারী বোঝা নিয়ে এক ইঞ্জিনে ওপরে ওঠা যাবে না।'

কি ঘটেছে জানার জন্যে দরজায় উঁকি দিয়েছিল কিশোর। বলল, 'তাপমাত্রা শূন্যের আটাশ ডিগ্রি নিচে। যতই দেরি হবে, আরও ঠাণ্ডা হতে থাকবে ইঞ্জিন।'

'তার আগেই একটা ব্যবস্থা করা দরকার,' ওমরের কণ্ঠেও উদ্বেগ প্রকাশ পেতে শুরু করেছে, শান্ত থাকতে পারছে না আর। 'ভুলটা হয়ে গেছে তখনই। এতটা ঠাণ্ডা হবে বুঝতে পারিনি, তাহলে রাইফেল নিয়ে পাহারায় না থেকে ইঞ্জিন গরম করার ব্যবস্থা করতাম। কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। কাজ সেরে ফেলো। আমি পাহারা দিচ্ছি, তোমরা গরম করতে থাকো।'

দমে গেছেন ক্যাপ্টেন। তীরে এসে তরী ডুবতে যাচ্ছে। সব যখন শেষ তখনই কিনা ইঞ্জিনটা বিগড়াল।

সীট থেকে নেমে গেল মুসা। গরম করার যন্ত্রপাতিগুলো বের করতে লাগল। যত তাড়াতাড়িই করুক, গরম করতে বেশ কয়েক মিনিট তো খরচ হবেই।

গুলির শব্দ হলো। থ্যাক করে বিমানের গায়েই কোনখানে ঢুকল যেন বুলেটটা। এর জন্যে তৈরি ছিল না সে। চমকে উঠল।

আবার শোনা গেল গুলির শব্দ। তবে এবার আর পোত্রাঘাইয়ের লোক নয়, গুলি করেছে ওমর। জবাব এল তার গুলির। সে-ও পাল্টা গুলি চালাল আবার। রবিনও নেমে গেছে। সে-ও গুলি করল।

দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল কিশোর। রাইফেলটা নিয়ে সে-ও নামবে কিনা ভাবছে; নাকি মুসাকে সাহায্য করতে যাবে। সিদ্ধান্ত নিতে পারল না।

শত্রুপক্ষের কারও গায়ে গুলি লেগেছে বলে মনে হলো না। বরফের দেশ বলেই এত গুলি চলার পরও হতাহত হয়নি এখনও কেউ, দূর থেকে গুলি করে লাগাতে পারছে না; বেঁচে যাচ্ছে অদ্ভুত সাদা আলোর কারণে। এই আলোয় কিছুতেই নিশানা ঠিক থাকছে না। আকাশ সাদা, মাটি সাদা, যেদিকে তাকানো যাচ্ছে সেদিকেই সাদা। কিছুক্ষণ আগেও এতটা সাদা ছিল না, তাপমাত্রা নেমে যাওয়াতে এই অবস্থা হয়েছে আরও; সূর্য দেখা যাচ্ছে না যে আর, তাই।

বরফের ওপর দিয়ে এক ঝলক বাতাস বয়ে এসে মুখে লাগল। ঠাণ্ডার চোটে সঙ্গে সঙ্গে পানি বেরিয়ে এল চোখে। বিচিত্র এই পরিবেশে এখন দুই দল মানুষের গোলাগুলি চালিয়ে একে অন্যকে ধ্বংস করে দেয়ার কথাটা ভাবতে কেমন অদ্ভুত লাগল তার। রীতিমত পাগলামি মনে হলো। সত্যি পাগল হয়ে গেছে যেন পোত্রাঘাই। নিজের গায়ে গুলি লাগার পরোয়াও করছে না আর। সোজা এগিয়ে আসছে বিমানটার দিকে। একটাই লক্ষ্য তার এখন, সোনাগুলো ছিনিয়ে নেয়া।

ক্রমেই কমে আসছে দূরত্ব। বেশিক্ষণ অক্ষত থাকতে পারবে না আর কেউ। কাছে এসে গেলে দু'পক্ষই গুলি খাওয়া শুরু করবে। তার আগে এখান থেকে পালাতে না পারলে ভয়ানক রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যাবে।

ওমরও বুঝতে পারছে সেটা। উদ্বেগে কালো হয়ে গেছে মুখ। মুসাকে তাড়াতাড়ি করার জন্যে চেঁচাতে লাগল।

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

গরম করছে আর একটু পর পরই ইঞ্জিনটা স্টার্ট নেয়ানোর চেষ্টা করছে মুসা। কোন কাজ হচ্ছে না। হঠাৎ একটা গুলির শব্দের পর রবিনের আর্তনাদ শোনা গেল। ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে, ডান হাতে বাঁ হাত চেপে ধরে ধীরে ধীরে বরফের ওপর বসে পড়ছে রবিন।

'এই, কি হলো!' চিৎকার করে উঠল ওমর, 'লেগেছে!'

দরজা থেকে লাফ দিয়ে নেমে গেলে কিশোর। টেনে-হিঁচড়ে সরিয়ে আনল রবিনকে।

কিশোর আর ক্যাপ্টেন মিলে প্লেনের ভেতরে তুলে আনল ওকে। মুসা ইঞ্জিন চালু করার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা আরও কমেছে। চোখে দেখা না গেলেও বলে দেয়া যায় তাপমাত্রার সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়ারও অবনতি ঘটছে। শুরু হবে ভয়াবহ তুষার ঝড়।

রবিনের হাতটা পরীক্ষা করে দেখল কিশোর। ভাগ্য ভাল, হাড়ে লাগেনি। চামড়ার সামান্য নিচে মাংস ফুটো করে বেরিয়ে গেছে। তবে প্রচুর রক্ত পড়ছে। তাড়াতাড়ি ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে রাইফেল তুলে নিল কিশোর। লড়াইটা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। থ্যাক করে এসে বিমানের গায়ে লাগল বুলেট। আর যেখানেই লাগুক, পেট্রল ট্যাংক ফুটো হলে এখন আর রক্ষা নেই। জিতে যাবে পোত্রাঘাইয়ের দল।

দরজা দিয়ে সবে বেরিয়েছে কিশোর, নতুন বিপদ এসে হাজির হলো। মাথার ওপর শোনা গেল প্লেনের ইঞ্জিনের শব্দ। উড়ে আসছে আরেকটা প্লেন। উত্তেজনা আর ব্যস্ততার কারণে রোজারের কথা ভুলেই গিয়েছিল ওরা।

রোজার আসাতে কোথায় খুশি হওয়ার কথা, তা না হয়ে হলো

শঙ্কিত। নিচে কি ঘটছে পুরোপুরি বুঝতে পারবে না রোজার, নিচে নামবে। দুটো বিমানই পড়বে বিপদে। কোনটা নিয়েই উড়ে যাওয়ার আর উপায় থাকবে না হয়তো।

কিশোরকে দেখে রোজারকে সঙ্কেত দিতে বলল ওমর, এখন যেন কোনমতেই না নামে। ওর নিজের এখন কোনদিকে নজর দেয়ার সময় নেই, শত্রুদের ঠেকাতেই ব্যস্ত। আরও কাছে চলে এসেছে পোত্রাঘাইয়ের লোকেরা।

কি করে সঙ্কেত দেবে বুঝতে পারল না কিশোর। রেডিওতে জানানোর সময় নেই। চক্কর দিয়ে নামতে শুরু করেছে রোজারের প্লেন। রাইফেলটা বরফের ওপর ফেলে দিয়ে একটামাত্র কাজই করতে পারল কিশোর, দুই হাত ওপরে তুলে টারজানের জংলীদের মত লাফানো শুরু করল, সেই সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চিৎকার। কোন কাজ হলো না তাতে। রোজার দেখল বলেও মনে হলো না। বরং খোলা জায়গায় বেরোনোতে শত্রুর গুলি থেকে অল্পের জন্যে বাঁচল কিশোর। বেশ কয়েকটা বুলেট শিস কেটে চলে গেল আশপাশ দিয়ে।

রোজারকে থামানোর আশা বাদ দিয়ে মাটিতে ডাইভ দিয়ে পড়ল সে। হাতে তুলে নিল আবার রাইফেল। অসহায় চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল দ্রুত উচ্চতা হারাচ্ছে বিমান। চাকাগুলো বরফ স্পর্শ করল। তারপর স্কি দুটো। রান করে ছুটে গেল একেবারে পোত্রাঘাইদের লক্ষ করে। যেন ওদের কাছে যাওয়ার জন্যে খেপে গেছে রোজার। মাথাটা কি বিগড়ে গেল নাকি ওর! চিৎকার করে ওকে সাবধান করতে গেল কিশোর। এক চিৎকার দিয়েই থেমে গেল। জানে, ওর চিৎকার প্লেনের ভেতরে বসা রোজারের কানে পৌঁছবে না কোনমতেই।

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

উল্লাসে চিৎকার করতে করতে প্লেনের দিকে ছুটে আসতে লাগল পোত্রাঘাইয়ের লোকেরা। কিছুই যে আর করার নেই, সেটা ওমরও বুঝতে পারছে। 'বোকা' ছেলেটার ওপর রাগ হতে লাগল। তবু হাল ছাড়ল না। কাছে চলে আসা লোকগুলোকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি করে চলল। এই প্রথম একটা লোক গুলি খেয়ে পড়ে গেল। কিন্তু তাতে থামল না বাকি লোকগুলো। একই ভাবে চিৎকার করতে করতে দৌড়ে যাচ্ছে প্লেনের দিকে। দরজা খুললেই চেপে ধরবে রোজারকে, কিংবা গুলি করে মারবে।

রাইফেল হাতে নেমে পড়েছেন ক্যাম্পবেল। আহত রবিনও বসে থাকতে পারেনি। ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত নিয়ে সে-ও নেমে এসেছে। রাইফেল দিয়ে গুলি করার জন্যে দুটো হাত দরকার, কিন্তু পিস্তল এক হাতেও চালাতে পারবে। অনবরত গুলি চালাতে লাগল চারজনে মিলে।

ঠিক এই সময় ইঞ্জিনটা স্টার্ট করে ফেলল মুসা। কিন্তু বেকায়দা অবস্থা হয়ে গেছে এখন। আর কয়েক মিনিট আগে করতে পারলেও এই ঘোরাল পরিস্থিতিটা এড়ানো যেত।

খুলে গেল রোজারের বিমানের দরজা। লাফ দিয়ে যাকে নামতে দেখল ওরা, হাঁ হয়ে গেল পাঁচজনেই।

থমকে গেছে পোত্রাঘাই আর দলবলও। রোজারের বিমান থেকে রোজার নামেনি, নেমেছেন নেভাল পুলিশের পোশাক পরা একজন অফিসার। তাঁর পেছন পেছন টপাটপ লাফিয়ে নেমে এল আরও কয়েকজন পুলিশ। সবার হাতে অস্ত্র।

পুলিশের আর গুলি চালানোর প্রয়োজন পড়ল না। দেখেই শামুকের মত গুটিয়ে গেছে পোত্রাঘাইয়ের বীর যোদ্ধারা। পোত্রাঘাই নিজেও হতভম্ব। গুলি করা দূরে থাক, কি করবে বুঝেই

উঠতে পারছে না। হঠাৎ নড়ে উঠল সে। পেছন ফিরে দৌড় মারল জাহাজের দিকে। নেতার বেহাল অবস্থা দেখে দলের লোকেরাও সাহস হারাল। যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে অস্ত্র ফেলে ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারল দৌড়াতে শুরু করল।

আদেশ শোনা গেল বাজখাঁই কণ্ঠে। থামতে বলা হলো ওদের। নইলে গুলি করা হবে।

কি আর করে বেচারারা। সোনা তো পেলই না, শুধু শুধু পুলিশের গুলিতে বেঘোরে প্রাণটা হারিয়ে বরফের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ার ঝুঁকি নিল না আর কেউ। এক এক করে ফিরে আসতে শুরু করল। তবে পোত্রাঘাই থামল না। সে ছুটতেই থাকল। হাস্যকর ভঙ্গিতে তার দুই পাশে ব্যাঙের মত লাফাতে লাফাতে ছুটছে তার দুই জাপানী মালিক ঘেউ আর বোকা।

রোজার নেমে ছুটে আসছে ওমরদের দিকে। ওরাও এগোল।

রোজারের হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল ওমর। 'তুমি যে পুলিশ নিয়ে আসবে, কল্পনাই করিনি। খুব ভাল করেছ। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

মুহূর্তে বদলে গেছে পুরো পরিস্থিতি। মরতে মরতে বেঁচে গেছে গোয়েন্দারা।

পোত্রাঘাই আর দুই সাঙ্গাতকে ধরে আনতে যাচ্ছিল কয়েকজন পুলিশ, বাধা দিল ওমর, 'অহেতুক কষ্ট করবেন। বরফের বাধা ডিঙিয়ে জাহাজ বের করতে পারবে না ওরা। এখন ধরে নেবেনই বা কিসে করে? থাক ব্যাটারা। পরে যখন খুশি জাহাজে করে এসে ধরে নিয়ে যেতে পারবেন। ধরে নেয়ারও দরকার পড়বে না। নিজেরাই সুড়সুড় করে গিয়ে জাহাজে উঠবে। বরফে থেকে মরার চেয়ে জেলখানা অনেক ভাল।'

ammamon@yahoo.com
www.murchona.com©

সহকারীদের বাধা দিলেন অফিসার। যেতে মানা করলেন। ওমরের দিকে ফিরে বললেন, 'সাগরের মুখটা বরফের দেয়ালে আটকে দিয়েছে, তাই না? ঠিক আছে ফিরেই যাই। জাহাজ নিয়ে আসব, পরে।'

'হ্যাঁ, সে-ই ভাল। এখন দুটো প্লেনে বোঝা ভাগাভাগি করে পালানো দরকার। দুজন জখমী মানুষ আছে সঙ্গে। আবহাওয়ার মতিগতিও সুবিধের না। ঝড় আসবে মনে হচ্ছে।'

তেরো

দুটো বিমানই নিরাপদে ফিরে এল গাউ আইল্যাণ্ডে। নামার সঙ্গে সঙ্গে রবিন আর জেনসেনকে নিয়ে গিয়ে ঢোকানো হলো চার বেডের খুদে হাসপাতালটায়। রবিনের ক্ষতটা ধুয়ে-মুছে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে তাকে ছেড়ে দেয়া হলো। কিন্তু জেনসেনের অবস্থা অত সহজে ছাড়ার মত নয়। তাকে রেখে দেয়া হলো।

যে দপ্তরের কাছ থেকে অভিযানের খরচ নিয়েছিল ওমর, তাদের সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ করল। নেভাল পুলিশের দায়িত্বে সোনাগুলো রেখে আসতে বলল তারা। একটা জাহাজ পাঠানো হচ্ছে সেগুলো নেয়ার জন্যে। খুশিই হলো ওমর, সোনা বড়ই বিপজ্জনক জিনিস। সঙ্গে থাকলে কোন দিক থেকে যে বিপদ এসে হাজির হয়, টেরও পাওয়া যায় না। তা ছাড়া ওজন কমে

যাওয়ায় প্লেন ওড়ানো যাবে সহজে। বহু পথ পাড়ি দিতে হবে এখনও।

গাউ আইল্যাণ্ডে বসেই প্লেন দুটোর ওভারহলিং করা হলো। কোন রকম যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটে কিনা পরীক্ষা করে দেখে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর একদিন দেশে রওনা হলো ওরা। রবিনের হাত ভাল হয়ে এসেছে, তবু সারাক্ষণ একটা স্লিঙে ঝুলিয়ে রাখার পরামর্শ দিলেন ডাক্তার। জেনসেনের জীবনের ঝুঁকি আর নেই, তবে শরীর পুরোপুরি সুস্থ ও মাথা ঠিক হতে আরও অনেক সময় লাগবে। আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে তাকে বড় হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

নিরাপদে আমেরিকায় ফিরে এল ওরা। সময় কাটতে লাগল। কয়েক মাস কেটে গেল দেখতে দেখতে।

পোত্রাঘাই আর তার দলের কোন খোঁজ পায়নি বহুদিন। না পাওয়ার কারণ আছে। কিশোররা আসার পর পরই ভয়াবহ তুষার ঝড় শুরু হয়েছিল, যেটা আর থামতেই চাইছিল না। সামান্য কমে তো আবার শুরু হয়। তার ওপর নেমে এসেছিল কুমেরুর ভয়াবহ, দীর্ঘ মেরুরাত্রি। জাহাজ নিয়ে বা অন্য কোনভাবেই ওখানে পৌঁছানো যাচ্ছিল না। অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল, নেভিও সাহস করেনি যেতে। কাজেই পোত্রাঘাইদের তুলে আনতে পারেনি।

দুর্যোগ কমে যাওয়ার পর নেভির একটা স্লুপ জাহাজ তুলে আনতে গেল ওদের। আঠারো জনের মধ্যে এগারো জন অবশিষ্ট আছে তখন। বেঁচে থাকাদের মধ্যে পোত্রাঘাইও নেই, নেই তার দুই সাঙ্গাত ঘেউয়া আর বোকাগুয়া। যারা বেঁচে ফিরল, স্বাভাবিকভাবেই মৃতদের ওপর দোষ চাপাল তারা; বলল, ওদের মৃত্যুর জন্যে ওরা নিজেরাই দায়ী।

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com

কাহিনীটা এ রকম : বরফের দেয়ালে সাগর-পথ রুদ্ধ করে দেয়ায় আর বেরোতে পারেনি বেত্রাঘাই। ধীরে ধীরে মাঝখানের খোলা অংশটুকুতেও বরফ জমে পানি একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়। স্টারি ক্রাউনের মত দুর্ভাগ্যের শিকার হয় জাহাজটা। জাহাজেই বাস করতে থাকে নাবিকেরা। যে চরিত্রের মানুষ ওরা, তাতে স্বাভাবিক ভাবে যা ঘটার তা-ই ঘটে। যখন তখন ঝগড়াঝাঁটি থেকে মারামারি এবং সবশেষে খুনোখুনি। গুলি খেয়ে মরল পোত্রাঘাই। ও এত অত্যাচার শুরু করেছিল, ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে ধরে একদিন জাহাজ থেকে ফেলে দেয় কয়েকজন নাবিক। পোত্রাঘাইয়ের পক্ষের লোকেরা বাধা দেয়। শুরু হয় গোলাগুলি। তাতে প্রাণ হারায় পোত্রাঘাই, ঘেউয়া আর বোকাশুয়া সহ আরও একজন। পোত্রাঘাইয়ের পক্ষের বাকি তিনজনের দু'জন মারা যায় অসুখে, আর তৃতীয়জনের মাথা খারাপ হয়ে গিয়ে জাহাজ থেকে নেমে দৌড় দেয় তুষার ঝড়ের মধ্যে। আর ফিরে আসেনি সে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

ক্যাপ্টেন ক্যাম্পবেল তাঁর ভাগের টাকা ছেলের হাতে তুলে দিয়ে একটা জাহাজের দায়িত্ব নিয়ে চলে গেছেন আবার সমুদ্রে। নিজের টাকা আর বাবার টাকা এক করে, সাইকেলের ব্যবসা তুলে দিয়ে গাড়ির ব্যবসা শুরু করেছে রোজার। ভালই আছে সে। সাইকেল ব্যবসার মত আর একঘেয়ে লাগে না।

কুমেরু অভিযানের কথা প্রায় ভুলতে বসেছে তিন গোয়েন্দা, এই সময় একটা চিঠি এলো ওদের নামে। জেনসেন লিখেছে। সুস্থ হয়ে আবার জাহাজেই চাকরি নিয়েছে সে, হপ্তাখানেকের মধ্যেই আমেরিকা ছাড়বে। তাকে বাঁচানোর জন্যে তিন গোয়েন্দা আর ওমর শরীফকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। আরও একটা গোপন কথা জানিয়েছে চিঠিতে : কয়েক মন

সোনার বার এখনও স্টারি ক্রাউনের ভেতরেই পড়ে আছে। সে সরিয়ে রেখেছিল। কারও চোখে পড়েনি বলে আনতে পারেনি। যেখানে রেখেছিল, সেখানেই রয়ে গেছে। তিন গোয়েন্দা আর ওমর যদি ইচ্ছে করে, কোথায় আছে জানাতে পারে সে। তবে ওগুলোর জন্যে সে নিজে আর যেতে রাজি নয় কোনমতেই। কোথায় যোগাযোগ করতে হবে তার সঙ্গে, ঠিকানা দিয়েছে। আর করলে সাতদিনের মধ্যে করতে হবে, তার জাহাজ লস অ্যাঞ্জেলেস ত্যাগ করার আগেই।

'আরও সোনা!' দুই হাত নেড়ে বলল মুসা, 'আমি আর এর মধ্যে নেই। মুরুব্বিদের অনেক দোয়া ছিল, তাই এ যাত্রা প্রাণে বেঁচে এসেছি। কি বলো, কিশোর?'

মৃদু হাসল কিশোর, 'আর কোন রহস্য নেই ওতে। শুধু কয়েক মন সোনার জন্যে প্রাণের ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে নেই।'

ওমরও মুচকি হাসল, 'খরচেও পোষাবে না।'

'তার চেয়ে যেখানে আছে সেখানেই পড়ে থাক,' মুসা বলল, 'ঘেউ আর বোকা যক্ষ হয়ে পাহারা দিক। সর্দার ভূতটা হবে পোত্রাঘাই।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'তারপর কেউ সেই সোনা আনতে গেলেই যাতে একটা করে চোখ দেখিয়ে প্যান্ট খারাপ করাতে পারে।'

আফসোস করতে লাগল মুসা, 'ইস্, তোমার দৌড়টা দেখতে পারলাম না। তাহলে অন্তত অনুমান করতে পারতাম, ভূতের ভয়ে দৌড় দিলে আমার চেহারাটা কেমন হয়!'

—: শেষ :—

Sumon

A lonely man in the crowded planet